লাল গোলাপ ধুসর আকাশ

অমরেন্দ্র কুমার ঘোষ

৫।১, রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

প্রকাশক :
প্রবীর মিত্র
৫।১ রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মুদ্রক :
শ্রীবিভূতি ভূষণ করোড়ী
২৭, মহেন্দ্র গোস্বামী লেন
কলিকাতা ৬

প্রচ্ছদপট : শচীন বিশ্বাস

উৎসর্গ

অমর কথাশিল্পী

৺অমরেন্দ্র নাথ ঘোষের

স্মৃতির উদ্দেশ্যে· · ·

এই লেখকের :

নানক বাণী, শ্রীঅরবিন্দর জীবন ও বাণী, যুগাচার্য স্বামী বিবেকানন্দ, ভক্ত রূপসনাতন, বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামী, গল্প নয় সত্যি, মহামানব বামাক্ষেপা, গৌর প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া।

এক

হরিদ্বারে পবিত্র গঙ্গার দুগ্ধধবল ধারার সন্নিকটে স্বামী তেজানন্দের যোগদা আশ্রম। স্বামিজী বসে আছেন মার্বেল পাথরের দালানে একটা তাকিয়ায় হেলান দিয়ে। সামনে বসে আত্মানন্দ গীতা পাঠ করছে। ষষ্ঠ অধ্যায় পাঠ সমাপ্ত প্রায়।

আত্মানন্দ পড়ছে—

"তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানীভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন॥" ৬।৪৬

অর্থাৎ, যোগী তপস্বী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং কর্মী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও।

আত্মানন্দ আবার পড়ছে,—

"যোগিনামপি সর্বেষাং মদগতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" ৬।৪৭

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আমাতে অন্তঃকরণ সমর্পণ করিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক আমাকে ভজনা করে, সে আমার মতে সকল যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

তেজানন্দ জলদগম্ভীর স্বরে বললেন, বুঝতে পেরেছ?

আত্মানন্দের মুখে কথা নেই। নীরব।

তেজানন্দ পুনরায় জিগ্যেস করলেন, বুঝতে পেরেছ? এবার আত্মানন্দ মৃদু হেসে ঘাড়টি ডান দিকে সামান্য ঝাঁকালো।

তেজানন্দ বললেন, আমি তোমাকে যে শিক্ষা দিচ্ছি সেটা হচ্ছে গীতোক্ত এই যোগ শিক্ষা। এ যুগে যোগশিক্ষা বড় কঠিন কর্ম। তবে সাধকের একান্ত চেষ্টা, নিষ্ঠা, ভক্তি ও তাঁর অপার কৃপা থাকলে

সে অতি সহজেই এই কর্মে সিদ্ধিলাভ করে। বিশেষ করে যার পূর্বজন্মে যোগীর জীবন ছিল। আমার মনে হয় তুমি পূর্বজন্মে যোগী ছিলে। তা না হলে যোগে তোমাকে এই বয়সে এমনভাবে আকৃষ্ট হতে এর আগে আর কাউকে দেখি নি।

আত্মানন্দ এবারও মৃদু হাসলো। তেজানন্দের দিকে অপলক নেত্রে তাকিয়ে রইলো গুরুর অমৃতঝরা বাণী শোনার জন্যে।

তেজানন্দ পুনরায় আরম্ভ করলেন বলতে, আসল কথা কি জানো? ধর্ম হচ্ছে অন্তরের জিনিস। যার অন্তর যত পরিস্কার, সুন্দর, ক্লেদশূন্য সে তত তাড়াতাড়ি ধার্মিক হতে পারে। অন্তর নির্মল থাকলে কোনরকম যোগযাগের দরকার হয় না। তখন ঈশ্বর দর্শন আপনি হয়ে যায়। তখন লীলাময় সুন্দরতম পরম প্রিয়তম ঈশ্বরের স্পর্শ, কথা, রূপ উপলব্ধি করা যায়। যোগীর আর কিছু পাওয়া বাকি থাকে না। সে তখন সবকিছু পায়। ইহলৌকিক সকল রকম চাওয়া-পাওয়া, শোকদুঃখ অশান্তির ওপর এক পরম আনন্দঘনরাজ্যে সে অবস্থান করে……

বলতে বলতে তেজানন্দ সমাধিস্থ হলেন। দু' একজন সন্ন্যাসী শিষ্য ভেতরের ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তারা হলো স্বামী গুণানন্দ ও প্রেমানন্দ।

আত্মানন্দ আসন ছেড়ে উঠে পড়লো। গুরুর কানের কাছে এসে ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলো।

আধঘণ্টা পরে তেজানন্দের সমাধি ভঙ্গ হলো। তাকিয়ে দেখলেন, সামনে গুনানন্দ, প্রেমানন্দ আর আত্মানন্দ।

প্রেমানন্দকে দেখে বললেন, ঠাকুরের চরণামৃত দাও।

প্রেমানন্দ বিষ্ণুর মন্দিরে এলো। শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী চতুর্ভূজ বিষ্ণুর কালোরঙের প্রতিমূর্তি। মুখখানি বড় সুন্দর। অমন বাঁশীর মত নাক। পদ্মপলাশলোচন। নাতিপ্রশস্ত ললাট। ঠোঁটের দু'পাশে আর আয়তচোখের কোণে ছড়ানো অকৃত্রিম প্রাণের হাসি। কি সুন্দর মূর্তি! সামনে এলে মূর্তির মুখের দিকে দু'দণ্ড তাকিয়ে

থাকতে ইচ্ছে করে। বাইরের বহু ভক্ত মন্দিরে আসে। এসে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে মূর্তির মুখপানে। আবার চলে যায়। কেউ কেউ সারাদিন বসে থাকে মূর্তির সামনে। সন্ধ্যার পর আরতি দেখে চলে যায়।

সন্ধ্যারতি করেন স্বামী তেজানন্দ। প্রাতঃ-আরতির ভার স্বামী প্রেমানন্দের ওপর। তেজানন্দকে বাদ দিয়ে আটজন আশ্রমিকের মধ্যে স্বামী প্রেমানন্দ বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাতন। তেজানন্দের অবর্তমানে প্রেমানন্দই হবে আশ্রম-কর্ণধার।

আত্মানন্দ আসার আগে আশ্রমে আশ্রমিকের সংখ্যা ছিল সাত। আগে অবশ্য আটজন ছিল। অঘোরানন্দ নামে একজন সন্ন্যাসী যুবক আশ্রম ছেড়ে গৃহবাসী হয়েছে। সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছে আত্মানন্দ।

আত্মানন্দ আশ্রমে এলে তেজানন্দ সহাস্যে প্রেমানন্দকে বললেন, আমরা আবার নবগ্রহ হয়েছি।

আশ্রম ছেড়ে চলে গেছে অঘোরানন্দ। বেশ সুন্দর সুপুরুষ চেহারা ছিল অঘোরানন্দের। অনেকদিন ছিল আশ্রমে। তেজানন্দ ওকে খুব স্নেহ করতেন। কিন্তু প্রলোভন তাকে অন্যপথে আকৃষ্ট করল। বছর চারেক আগে দুর্গাপূজার সময় এক বাঙালী পরিবার আসে হরিদ্বারে বেড়াতে। সে পরিবারের চারজন মাত্র লোক। কর্তা, গিন্নী, আর দু'টি ছেলেমেয়ে। মেয়ে বড়। নাম দুর্গা। বয়স হবে আঠারো। ছেলে ছোট। নাম প্রসন্ন। বয়স হবে দশ।

আশ্রমের কাছেই একটা ধর্মশালা আছে। সেখানে এসে উঠেছিল তারা। দুর্গার রূপ অপরূপ। নামে যেমন দুর্গা, রূপেও তেমন। লাখে একটা মেলে হয়ত অমন মেয়ে। দুর্গা কয়েকদিন সকালে একা একা গঙ্গাস্নানে আসতো। গঙ্গার ধারেই আশ্রম। আশ্রমিকগণ ঐ সময় গঙ্গাস্নানে আসে। অঘোরানন্দ সকলের আগে এসে স্নান আহ্নিক করতো। সে দুর্গাকে দেখতে পেলো। পথে একদিন দুর্গাকে বললে, আমাকে নিয়ে ঘর করবে?

দুর্গা প্রথমে কথা কয় নি। মুখ টিপে হেসে গা দুলিয়ে চলে

এসেছিল। সেদিন তার আ-নিতম্ব ভিজে কালো চুলের শোভা আর গায়ের কাঁচা হলুদের মত রঙের দীপ্তি অঘোরানন্দকে পাগল করে তুলেছিল।

অঘোরানন্দের যোগফল একদিনে মাটি হয়ে গেল গঙ্গার মাটির সঙ্গে। দুর্গার রূপ তার মনোমধ্যে এক অঘটন ঘটালো।

সদ্যমুক্ত পর্বতগুহায় আবদ্ধ স্রোতস্বিনীর ন্যায় কামাবেগ তার হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন ও মোহগ্রস্ত করে ফেললো।

দ্বিতীয় দিন আবার বললে, দুর্গা, আমি তোমাকে চাই। তুমি আমায় বিয়ে করো।

এবারও দুর্গা কথা কয়নি। ওমনি একটু হেসে তারপর মুখ গম্ভীর করে চলে এলো ধর্মশালায়।

অঘোরানন্দ দুর্গার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো। তার সুন্দর সুউচ্চ নিতম্বের স্বর্ণাভা ভেজা-কাপড় ভেদ করে বাইরে ঠিকরে পড়েছে। চলনে অপরূপ হিল্লোল জেগেছে। দুর্গা মাঝপথে পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো অঘোরানন্দের শ্যেনদৃষ্টি তার প্রতি। সে দ্বিগুণ রাগে ও ঘেন্নায় নাক সিঁটকে, মুখ বিকৃত করে কটমট্ করে তাকালো কামকাতর অঘোরানন্দের মদালস মুখের দিকে। ব্রহ্মচারী অঘোরানন্দের দৃষ্টি দুর্গার সে বক্র ও ক্ষিপ্ত চাহনি সহ্য করতে পারে নি। লজ্জায় মাথা নত করেছে। চোখ ফিরিয়ে নিয়ে দাঁত দিয়ে নিজের ঠোঁট কামড়েছে।

তার পরের দিন গেল সে আবার স্নান করতে। অঘোরানন্দ ঠিক তেমনিভাবে অনিমেষ নয়নে তাকিয়ে অপেক্ষা করলো দুর্গার আসাপথে।

দুর্গা দূর থেকে দেখতে পেলো অঘোরানন্দকে। দু'পাটি সাদা চক্চকে দাঁতের ফাঁকে ঠোঁট দু'টি দুমড়ে গায়ের কাপড়টা ঈষৎ টেনে মুখ নিচু করে চলে এলো স্নানের ঘাটে।

অঘোরানন্দ একদৃষ্টিতে তাকালো তার সুপুষ্ট কমনীয় গৌর-কান্তির দিকে।

স্নান সেরে ফিরে এলো দুর্গা। এবার অঘোরানন্দ তার পথরোধ করে দাঁড়ালো। দুর্গা আপত্তি করলো। কোকিলকণ্ঠে বললে, পথ ছাড়ুন।

অঘোরানন্দ বললে, না।

দুর্গা বললে, চেঁচাব।

অঘোরানন্দ বললে, না দুর্গা। ও কাজ কোরো না। আমার একটা মাত্র কথা শোনো। একটুখানি দাঁড়াও।

কি মনে করে দুর্গা দাঁড়িয়ে গেল। অঘোরানন্দ বললে, আমি যদি তোমাকে বিয়ে করে সংসারী হই ?

অঘোরানন্দের কাছ থেকে এরকম প্রস্তাব আসবে এ আশা দুর্গা করে নি। তার মনে ঘৃণার উদ্রেক হলো। এই বয়সে তার সন্ন্যাসী সম্বন্ধে সঠিক ধারণা না থাকলেও তার মায়ের মুখ থেকে শোনা কথায় ভাবলে, সন্ন্যাসী সর্বত্যাগী। তার মন সংসারে আবদ্ধ হবে কেন ? সে ঈশ্বরের চিন্তা করবে। মেয়ের চিন্তা করবে কেন ?

ক্ষণিক চিন্তা করে স্বামিজীকে বললে, আপনি সন্ন্যাসী। আপনার মুখে এ কথা শোভা পায় না। পথ ছাড়ুন। আমাকে যেতে দিন।

অঘোরানন্দ পথ ছাড়লো না। জোর করে দু'বাহু বাড়িয়ে দুর্গাকে ধরতে গেল। দুর্গা একপ্রকার দৌড়ে চলে এলো ধর্মশালায়। ভিজে কাপড়েই মায়ের কাছে এসে বসে পড়লো। কান্নায় ভেঙে পড়লো লতিকা।

মা পার্বতী শুধোলেন, কি হয়েছে রে দুর্গা ? ওরকম করছিস কেন ?

কোন উত্তর দিলে না দুর্গা। অঝোরে কাঁদলে। অনেক করে জিজ্ঞাসাবাদ করতে একটিমাত্র কথা বেরিয়ে এলো তার মুখ থেকে, মা, এখানে আর থেকো না। এখাম থেকে অন্যত্র চলো।

পার্বতী বিস্মিত হয়ে শুধোলেন, কেন ?

দুর্গা কিছু বললো না। বলতে পারলো না। আয়তচোখ-

ছুটির দু'প্রান্তে বর্ষার প্লাবনের মত অশ্রু নিয়ে তাকিয়ে রইলো ছলছলিয়ে মায়ের জিজ্ঞাসু মুখপানে।

মেয়েরা মেয়েদের মনের ভাব বুঝতে পারে। কথায় না প্রকাশ করলেও অন্তরের ভাব মুখমণ্ডলে প্রতিভাত হয়। দু'চার দণ্ড পরে পার্বতী জানতে পারলেন দুর্গার ও কথার মানে।

ওদিকে অঘোরানন্দকে অত্যধিক বিচলিত হতে দেখে স্বামী তেজানন্দ প্রশ্ন করলেন, অঘোর, তোমাকে এ'কদিন খুব বিচলিত দেখছি কেন? কি হয়েছে তোমার?

অঘোরানন্দ প্রথমে চেপে গেল প্রসঙ্গটি। কিন্তু সে জানে গুরুর কাছে কোন জিনিস লুকোতে নেই। তাই বলে ফেললো, আমার একটা ভিক্ষা আছে আপনার কাছে।

তেজানন্দ বললেন, কি ভিক্ষা?

—আপনি কি রাখবেন?

—রাখবার হলে নিশ্চয়ই রাখবো।

—আমি বিয়ে করতে চাই।

—সেকি? তুমি আজন্ম ব্রহ্মচারী। যোগের পথে চলেছ। সামান্য সংসারের প্রতি তোমার মোহ কেন?

গুরুর কথা শুনে অঘোরানন্দ চুপ করে রইলো। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি যেন ভাবলো।

তেজানন্দ এদিক ওদিক একবার তাকিয়ে গম্ভীরস্বরে বললেন, হঠাৎ বিয়েতে তোমার মন গেল কেন? তুমি কি যোগভ্রষ্ট হতে চাও? লোক কত পুণ্য করলে তবে যোগী হতে পারে। আর তুমি কি তাই হয়ে নষ্ট হতে চাও?

অঘোরানন্দ বললে, আপনার কথা মানি। কিন্তু আমার মন বড় চঞ্চল। কিছুতেই মনস্থির করতে পারছি না। দু'দিন যাবৎ স্বপ্নও দেখলুম, আমার বিয়ে করা উচিত।

—মন আপনিই স্থির হবে। দু'চারদিন সাধনভজন করলে ছড়ানো মন গুটিয়ে আসবে। আর স্বপ্নের কথা বলছো।

ও কিছু নয়। মন চঞ্চল হলে ওরকম দু'একটা ভ্রষ্ট স্বপ্ন যোগীরা দেখে।

—না গুরুদেব। আজ্ঞা করুন। আমি বিয়ে করবো।

—সে কি অঘোরানন্দ! তুমি আমার শিষ্য হয়ে এরকম ক্লীব হলে কবে থেকে?

—ক্লীব নয় স্বামিজী। বিয়ে করে আমি সংসারী হতে চাই। সংসারী হওয়া কি ধর্ম নয়?

—জানি তাও ধর্ম। কিন্তু তোমার পক্ষে নয়। তুমি সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেক ওপরে আছ। তোমার মুখে এরকম নশ্বর সুখের কথা সাজে না।

—কিন্তু—

—কিন্তু কি! আমি যা বলেছি তাই ঠিক। একবার ভেবে দেখো।

সেদিন আর কোন কথা বললো না অঘোরানন্দ। পরের দিন সকালে এলো আবার গুরুর কাছে। বললে, আমি ভেবেছি স্বামিজী। অনেক ভেবেও মনকে শান্ত করতে পারি নি। এখন দেখছি বিয়ে করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় নেই।

তেজানন্দ এবার যেন একটু নরম হলেন। শান্তস্বরে বললেন, বিয়ে করলে এখানে থাকা চলবে না। তোমাকে আশ্রম ত্যাগ করতে হবে।

—তাই করবো স্বামিজী। আমি সংসারীদের মাঝে থেকে সংসারধর্ম পালন করবো।

—তাই যেয়ো। কিন্তু কাকে বিয়ে করবে শুনি?

—দুর্গাকে।

—দুর্গাকে!

—চারদিন আগে কোলকাতা থেকে এক বাঙালী পরিবার এখানে এসেছেন। ঐ ধর্মশালায় আছেন। ওঁদেরই এক মেয়ে আছে। দেখতে পরমা সুন্দরী। তাকেই বিয়ে করবো।

—তার নাম দুর্গা ?

—হ্যাঁ।

—তারা ত কাল সন্ধ্যায় আমার আশ্রমে এসেছিল।

অঘোরানন্দের মুখমণ্ডল হাস্যদীপ্ত হলো। বললে, কখন এসেছিল স্বামিজী ?

—তুমি তখন ছিলেনা। তবে তোমার সম্বন্ধে সব কথা শুনেছি মেয়েটির মায়ের কাছ থেকে। ঐ মেয়েটির জন্যে তুমি যে পাগল হয়েছ সে খবরও পেয়েছি। আর মেয়েটিও চাইছে তোমাকে স্বামীরূপে লাভ করতে।

একটু থেমে স্বামিজী বললেন, বেশ বিয়ে করো। আমার আর কোন আপত্তি থাকবে না।

—আপনার আশীর্বাদ চাই।

—আমি আশীর্বাদ করছি, ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

দু'দিন পরে আশ্রম-আঙিনার পবিত্র বিষ্ণুমন্দিরের সামনে বসে অঘোরানন্দের সঙ্গে দুর্গার বৈদিকমতে বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের মন্ত্রপাঠ করলেন স্বয়ং তেজানন্দ।

দুই

প্রেমানন্দ বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ করেই মূর্তির মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। পরে লঘু নিশ্বাস ছেড়ে বললে, মঙ্গলময় ঠাকুর মঙ্গল করো।

তার গম্ভীর অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর স্পষ্ট হয়ে উঠলো মন্দিরের সুউচ্চ চূড়াতল স্পর্শ করে।

পরে বিগ্রহ-সামনে নতজানু হয়ে প্রণাম করলো। কোশাকুসি থেকে চরণামৃত নিলো। চলে এলো গুরুর কাছে।

তেজানন্দ চরণামৃতর অপেক্ষায় বসেছিলেন। প্রেমানন্দের চরণামৃত পেয়ে গভীর তৃপ্তির সঙ্গে পান করলেন। 'শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু'

বলতে বলতে হাতটা মাথায় দু' একবার রাখলেন। পরে আত্মানন্দকে বললেন, আজ থাক, কাল আবার পাঠ কোরো। আজ একটু বিশ্রাম দরকার।

গীতাপাঠ সমাপ্ত করে আত্মানন্দ উঠে পড়লো। এমন সময় ডাক-পিয়ন এসে তার হাতে একখানা চিঠি দিলো। আত্মানন্দেরই চিঠি।

আশ্রমে দশ বছর ধরে আছে আত্মানন্দ। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সে কারও কাছ থেকে একখানা চিঠি পায় নি। আজ হঠাৎ চিঠি দিল কে?

তেজানন্দ চিঠির কথা জানতে পারেন নি। জানলে কৈফিয়ৎ তলব করতেন। তিনি ইতিমধ্যে নিদ্রাভিভূত। প্রেমানন্দ দূর থেকে দেখেছে চিঠিটা। কিছু বলে নি। সামান্য হেসে চলে গেছে।

আত্মানন্দ চিঠিটা হাতে নিয়ে ঘরে এলো। দরজায় খিল লাগিয়ে খামটা ছিঁড়ে ফেললো। একটা ছোট চিরকুটে গুটিকতক কথা লেখা। আঁকাবাঁকা কাঁচা হাতের লেখা। মনে হয় ছোট ছেলের লেখা।

আত্মানন্দ চিঠিটা পড়লো,

সাউথ্ গড়িয়া রোড্

পরম পূজনীয় বাবা,   ৩রা ফাল্গুন, ১৩৬৭

তুমি আমাদের খবর নাও না কিন্তু আমরা তোমার খবর রাখি। আমি এখন অনেক বড় হয়েছি। লেখাপড়া করছি। বেশ লিখতে শিখেছি। তাই তোমাকে চিঠি লিখলুম। মা ভাল আছে। আমি ভাল আছি। আশাকরি তুমি ভাল আছ। আমার সভক্তি প্রণাম নিও। ইতি—

তোমার

স্নেহের দুলাল বাপি।

চিঠি পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মানন্দের ভাবান্তর হলো। তার হৃদয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিলো। বাক্‌শক্তি রোধ হলো। হাত কাঁপতে লাগলো। চোখ ঝাপসা হয়ে এলো। তবু আর একবার পড়ে নিলো চিঠিটা।

পড়ার পর খামের মধ্যে পুরে হাতের ভাঁজে রাখলো। তক্তা-পোষের ওপর বসে ভাবলো অনেক কথা। ভাবলো তার স্ত্রী রমার কথা আর তার ছেলের কথা।

সে এখন ছেলের বাপ। আগে একথা জানত না। বিয়ের মাত্র তিন মাস পর থেকে সে ঘরছাড়া। দশবছর আগে সে সংসারী ছিল। তার নাম ছিল শচীকান্ত। আর আজ সে সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী। এই মাত্র দশ বছরের মধ্যে এত বড় পরিবর্তন তার জীবনে ঘটে গেছে। ভাবলেও হাসি পায়।

আত্মানন্দের হৃদয়টি ক্ষণিকের জন্যে মায়াকান্নায় উদ্বেল হয়ে উঠলো। তার চোখে জল। আবার হাসিও জাগলো। যখন ভাবলো, জগদীশ্বরের একি লীলা খেলা! কত সাধ করে তার মা বকুলরাণী ছেলেকে বিয়ে দিয়ে ঘরে রাঙা টুকটুকে বৌ এনেছিলেন। শচীকান্তরও খুব পছন্দ হয়েছিল রমাকে। বিয়ে করলো। বিয়ের পর তিনমাস হেসেখেলে কাটলো। তারপর দুঃখের কালো যবনিকা এসে শচীকান্ত ও রমাকে দিল আলাদা করে। কালচক্রের করাল-গ্রাস দু'টি নবজীবনের মধুময় প্রাণের নব নব আশা মুকুলিত হতে দিল না। কালবৈশাখীর ঝড়ে ছিন্নবিছিন্ন হয়ে গেল সব।

কোলকাতায় শচীকান্তর বাড়ী। সেখানে তার স্ত্রী আছে। বাবা, ভাই, বোন, মা, দাদা সকলেই আছে। আর সে কোলকাতা থেকে কতদূরে হরিদ্বারে এসে রয়েছে। এই সুদূর পথে পাড়ি জমিয়ে কে নিলো তার সন্ধান? তার স্ত্রী বা বাড়ীর লোক কেমন করে জানলো তার ঠিকানা? তবে কি জয়া দিয়েছে সংবাদ?

তারপর আরও ভাবে, এই চিঠিটা যদি কোন গুরুভাইয়ের হাতে পড়তো কিংবা গুরুদেবের হাতে; তাহলে ত মহা হুলুস্থুল পড়ে যেত। কেননা গুরুদেব থেকে আরম্ভ করে আশ্রমের সকলেই জানে সে অবিবাহিত। ও! ভগবান তাকে খুব রক্ষা করেছেন। ঈশ্বরকে কি বলে যে ধন্যবাদ দেবে তা ভেবে পেলো না।

আশ্রমের ঘণ্টা বাজলো। মধ্যাহ্ন-আহারের ঘণ্টা। আত্মানন্দ

চিঠিটা অতি গুপ্তস্থানে রেখে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে এলো। দেখলো, গুরুভাই প্রেমানন্দ ও গুণানন্দের সঙ্গে অখিলানন্দ, অদ্বৈতানন্দ, ক্ষমানন্দ, শান্তিনন্দ ও ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভাইরা চলেছে মধ্যাহ্নভোজনে। সেও তাদের সঙ্গ নিলো।

গঙ্গার ধারেই আশ্রম। আশ্রমের সামনে একটা ছোট ফুলের বাগান। বাগান পেরুলেই মন্দির। মন্দিরসংলগ্ন একটা ঘর। সেই ঘরে আছেন আশ্রমকর্তা তেজানন্দ। মন্দিরের সামনে মার্বেল পাথরের ছোট দালান। দালানের ওপরে ছাদ আছে। মন্দিরের পেছনে একটা ছোট মাঠ। তার দু'ধারে কয়েকটি সারিবদ্ধ ঘর। একদিকে থাকে সন্ন্যাসীরা। অন্যদিকে ভাঁড়ারঘর, রান্নাঘর, খাবার ঘর ইত্যাদি।

তিন

কোলকাতায় আহিরীটোলায় থাকেন শচীকান্তর পিতা বাণীপ্রসাদ। নিজেদের বাড়ী। দোতলা। নীচে চারখানা ঘর আর ওপরে তিনখানা। রান্নাঘর, ভাঁড়ারঘর আলাদা। বাড়ীটা অনেক-কালের। বাণীপ্রসাদের বাবা রামপ্রসাদের আমলে তৈরী হয়েছে।

বাণীপ্রসাদ ডাক্তার। পসার মন্দ নয়। সংসার বেশ সচ্ছলভাবে চলে যায়। সুধাকান্ত বড় ছেলে। শচীকান্ত মেজ। সুধাকান্ত চাকরী করে। রেলওয়ে কর্মচারী। শচীকান্ত ব্যাঙ্কের কেরানী।

বি. এ. পর্য্যন্ত পড়েছে শচীকান্ত। তারপর আর পড়া হয় নি। চাকরীতে ঢুকেছে। বিয়ে করার মন ছিল না। বাণীপ্রসাদও মেজ ছেলের বিয়েতে প্রথমে গররাজী হয়েছিলেন। তার কারণও আছে। মেজ ছেলের কোষ্ঠী তত ভাল নয়। ও ছেলের ভাগ্যে সন্ন্যাসী যোগ আছে। ঘর সংসারের বাঁধন নেই। তাই জেনে শুনে একজন পরের মেয়েকে ঘরে এনে অযথা কষ্ট দেওয়ার পক্ষপাতী তিনি নন।

কিন্তু স্নেহাতুরা মাতা বকুলরাণীর একান্ত পীড়াপীড়িতে বাণীপ্রসাদ রাজী হলেন। বিভিন্ন জায়গায় মেয়ে দেখলেন। অনেকে কোষ্ঠী দেখে মুখ ফেরালো। অনেকে রাজী হলো। যারা রাজী হলো তারা কোষ্ঠী দেখে নি। বাণীপ্রসাদ ইচ্ছে করেই তাদের কোষ্ঠী দেখান নি। তাদের মধ্যে একজনের মেয়েকে পরমাসুন্দরী দেখে তার সঙ্গেই শচীকান্তর বিয়ের ঠিকঠাক করে ফেললেন।

মেয়ের নাম রমা। যেমন নাম তেমনি রূপ। ঠিক যেন জ্যান্ত দুর্গা। রমার বাবা তেজেন্দ্র অতি অমায়িক লোক। দক্ষিণ কোলকাতায় কাঠের ব্যবসা আছে। বাণীপ্রসাদের মধুর ব্যবহারে প্রীত হলেন। বললেন, আমার রমা মা আপনার ঘরে গেলে বেশ সুখী হবে। এ আমি ঠিক জানি।

বাণীপ্রসাদ একগাল হেসে অতিশয় বিনয়নম্র সুরে গলাটা মিহি করে বললেন, আপনার আশীর্বাদ সত্য হোক এই প্রার্থনাই আমি ঈশ্বরের কাছে করছি। কিন্তু একটা কথা কি জানেন?

—কি কথা? উৎসুক হয়ে শুধোন তেজেন্দ্র।

বাণীপ্রসাদ বললেন, দেখুন, সুখ নিজের ভাগ্যের ওপর নির্ভর করছে। কেউ জোর করে কাউকে সুখী করতে পারে না। ভাগ্যে থাকলে আপনার মেয়ে আমার মত গরীবের ঘরে রাজরাণী হয়ে থাকবে।

ভাবী বেয়াই মশাইয়ের কথা তারিফ করে তেজেন্দ্র বললেন, তাত ঠিক কথা, তাত ঠিক কথা।

একটু হেসে বললেন, রমা আমার একমাত্র কন্যা। বড় আদরের মেয়ে। ওকে আমি অনেক চেষ্টা করে লেখাপড়া শিখিয়েছি। পয়সা খরচ করে নয়, জোর তাগিদ দিয়ে। পড়ায় ওর মোটে মন ছিল না। তাই মাষ্টার রেখে কিছু হয় নি, নিজেকেও মাঝে মাঝে দেখতে হতো।

বাণীপ্রসাদ বললেন, সেত দেখতেই হবে। বাপ-মা ছেলে-মেয়েদের না দেখলে ঠিকমত মানুষ হয় না······

বাণীপ্রসাদের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তেজেন্দ্র বললেন, Exactly! তারপর চুরুটে একটা লম্বা টান দিয়ে ঘরময় এক মুখ কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ছেড়ে পুনরায় বললেন, জানতুম তাতে করে আমার ব্যবসায় ক্ষতি হচ্ছিল তবু আমি মেয়ের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চিরসজাগ ছিলুম ও এখনো আছি।······জানি আজকালকার যুগ বড় মন্দ। এ যুগে নারী শিক্ষা most essential। তাই তাকে neglect করতে পারিনে। পড়ায় ওর মন না থাকলেও জোর করে, অধিক পয়সা ব্যয় কবে পড়িয়েছি। এও জানি, লেখাপড়া শেখাটা নিছক চাকরীর জন্যে নয়, জ্ঞানের জন্যেও বটে। তাছাড়া ভাগ্য বিমুখ হলে মানুষকে অনেক অভাবিত কাজ করতে হয়। সেই সব কাজে শক্তি দরকার। বিদ্যা, ধন ইত্যাদি হলো সেই শক্তি। তাই ভেবে আমি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছি। নিছক স্নেহের পুত্তলী করে রাখি নি।

তেজেন্দ্রর ঐ দীর্ঘ বক্তৃতাতুল্য কথাটি শোনার পর বাণীপ্রসাদ বললেন, আপনার ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির তুলনা হয় না। আপনি মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়ে ভাল কাজই করেছেন।

বাণীপ্রসাদ আরও কি বলতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় তেজেন্দ্র বললেন, তাতেও অনেক বাধা পেয়েছি। ওর মা উচ্চ শিক্ষায় গররাজী ছিলো। বললে কি জানেন?

—কি?

—বললে, আমরা কত লেখাপড়া শিখেছি! অথচ বেশ শান্তিতে ঘরকন্না ত করছি। মেয়েদের কলেজে পাঠিয়ে কি হবে? ওরা কি অফিসে চাকরী করবে? হবে ত গেরস্তের বৌ। ইত্যাদি ইত্যাদি অনেক কথা। তারপর আমার ছেলে অমলাংশুর কথায় উনি শেষ পর্য্যন্ত রাজী হলেন। মেয়ে স্কুল থেকে কলেজে ঢুকলো। এখন সে আই. এ পাশ করেছে। বি. এ পড়ার খুব ইচ্ছে। আমি রাজী আছি। তবে এর মধ্যে ভাল পাত্র জুটলে বিয়ে দিয়ে দেবো।

তারপর বললেন, আপনার ছেলে শ্রীমান শচীকান্ত শুনেছি ভাল

ছেলে। ওর হাতেই আমার রমাকে তুলে দেবো। ভাবছি—তবে ওর কি মত— ?

—ওর আবার কি মত! আমি পছন্দ করলেই ও পছন্দ করবে। তাছাড়া আপনার মেয়ে ত দেখতে শুনতে খারাপ নয়।

—দেখলেনই ত। আমি আর কি বলবো। এবার শ্রীমান দেখে যদি পছন্দ করে ত বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে ফেলি।

বাণীপ্রসাদ বললেন, ওর দেখবার প্রয়োজন নেই। আমার বড় ছেলে সুধাকান্ত দেখলেই বিয়ের ব্যবস্থা পাকা হবে।

তেজেন্দ্র বাধা দিয়ে বললেন, না, তা হয় না। সে যুগ পালটে গেছে বাণীবাবু। আজকাল অন্য যুগ। এখন স্বয়ং পাত্র এসে পাত্রীকে দেখে পছন্দ করলে তবে বিয়ে হয়। যে যুগে যা সত্য তাকে মানতেই হবে। তাকে অস্বীকার করতে পারি না। তা করলে দুঃখ পেতে হবে।

বাণীপ্রসাদ স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন, বেশ, তাই হবে। আমার কোন আপত্তি নেই। কবে তাহলে দেখতে আসবে?

—এই সামনের রবিবার। কেমন?

—তাই হবে। আচ্ছা, আজ তাহলে আসি। দেনা-পাওনার কথা পরে হবে।

তেজেন্দ্র হেসে বললেন, আগে ছেলের মেয়ে পছন্দ হোক। তারপর দেনাপাওনার কথা।

— আপনার কথাই রইলো।

বাণীপ্রসাদ সেদিন আর কোথাও না গিয়ে বাড়ীতে চলে এলেন। রাস্তায় আসতে আসতে ভাবতে লাগলেন, আজকাল যুগটা কি রকম হয়েছে। আগে আমাদের সময় পাত্ররা পাত্রী দেখতে যেত না। পাত্রর বাবা যে রকমটি দেখে বিয়ে দিতেন পাত্র তাই মাথার মণি করে রাখতো। এখন যেন সবই উল্টো। আহা, বেশী লেখাপড়ার কি গুণ! আমাদের সময় নারীপ্রগতির কথাও শুনি নি। আর এ রকম ফ্রি মিক্সিংএর চলনও ছিল না।

চার

শচীকান্ত ব্যাগ্ হাতে বাজারে আসছিল। পথে বাল্যবন্ধু জয়ার সঙ্গে তার দেখা। ওদেরই পাড়ায় থাকে জয়া। আধ মাইল দূরে ওদের বাড়ী। জয়াকে শচীকান্ত বললে, প্রাতঃ প্রণাম।

জয়া একগাল হেসে বললে, এত বেলায় প্রাতঃ প্রণাম?

—বেলা কোথায়? এই ত সবে ঘুম ভাঙ্লো। ঘুম থেকে উঠেই বাজারে যাচ্ছি।

—বাবা, বেলা হয় নি ত কি! দেখতো ঘড়িতে কটা বেজেছে! জয়া নিজের রিস্ট্ওয়াচ্টা শচীকান্তর চোখের কাছে নিয়ে এলো।

শচীকান্ত দেখে বললে, হ্যাঁ। আমি ত বলেছি, আটটা বেজেছে। তাতে এমন কি একটা কাণ্ড হয়েছে!

—কাণ্ড হয় নি। চোত মাসের বেলা। সকাল আট্টার সময় বেলা বেশ হয়। এখন আটটার সময় যদি তোর ঘুম ভাঙে তাহলে বিয়ে হলে কখন ঘুম ভাঙ্বে?

শচীকান্ত মুচকী হেসে বললে, বিয়ে হলে এর চেয়ে সকাল সকাল উঠবো।

—ধ্যেৎ! তা কখনো হয়। বরং তখন এর চাইতে বেশী বেলা হবে। অফিস যাওয়ার আগে ঘুম ভাঙবে।

শচীকান্ত মুখ ভেঙ্চে বললে, তোর যেমন মরণ। তাই কখনো হয়। কেউ যেন বিয়ে করে নি আর অফিস যায় নি।

—তা কেন করবে না। তবে তোর কথা একটু স্বতন্ত্র। ব্যাচিলার মানুষ যদি এতক্ষণ পর্যন্ত ঘুমোয় তাহলে বিয়ে হলে সে কি করবে—হাজার হোক night অভিসারের ত একটা আক্কেল সেলামী দিতে হয়।

শচীকান্ত বললে, তোর সঙ্গে কথায় পেরে উঠবো না। তোরা হচ্ছিস্ আজকালকার নব্য যুবক।

—আর তোরা ?

—আমরা একেলে হয়েও সেকেলে। তাতেই আমরা সুখী।

—সুখী না হাতি। দেখবি বৌ এসে চিমটি কাটবে।

শচীকান্ত একগাল হেসে বললে, ভালইত তাতে বরং তাড়াতাড়ি ঘুম ভাঙবে।

তারপর বললে, তোকে কে বললো, আমি বিয়ে করবো ?

—কেন মেশোমশাই বললেন। কাল ত উনি আমাদের বাড়ীতে গিয়েছিলেন সন্ধ্যের সময়।

—তাই নাকি! বিস্ময় প্রকাশ করে শচীকান্ত।

জয়া সাধারণভাবে বললে, হ্যাঁ। তিনি তোর জন্যে মেয়ে দেখে এসেছেন। এবার আমরা দু'জনে অর্থাৎ তুই আর আমি মেয়ে দেখতে যাবো।

শচীকান্ত বিদ্রূপের সুরে বললে, দেখছি, তোদের মাথা খারাপ হয়েছে। কথায় আছে না, যার বিয়ে তার হুঁশ নেই, পাড়াপড়শীর ঘুম নেই।

জয়া বন্ধুর কথায় বাধা দিয়ে বললে, থাক, তোকে আর বাজে কথা বলতে হবে না। আমি সব শুনেছি। যা শুনেছি সব সত্যি। তুই মেয়ে দেখার জন্যে তৈরী হ'। আগামী রবিবার সকালে আমরা সবান্ধবে গড়িয়াহাটায় যাবো মেয়ে দেখতে। মেয়ে নাকি পরমাসুন্দরী। আশাকরি তোর সঙ্গে বেশ মানাবে।

শচীকান্ত উত্তেজিত হয়ে বললে, আঃ কি হচ্ছে জয়া। আমি যা শুনতে ভালবাসি না তাই নিয়ে তোরা আমার কানের কাছে ঘ্যান্ ঘ্যান্ প্যান্ প্যান্ করিস কেন বল দিকিনি। এসব তোদের কি রোগ ?

জয়া হেসে বললে, ঘোড়া রোগ।

শচীকান্ত কিছু বললো না।

জয়া আবার বলতে আরম্ভ করে, বিয়ে করবি না তো কি সন্ন্যাসী হবি ?

—হ্যাঁ, তাই হবো। উত্তর এলো শচীকান্তর।

—তাহলে আজই তুই হরিদ্বারে চলে যা। বাবার বন্ধু আশুতোষ বাবুর গুরু তেজানন্দের যোগদা আশ্রম আছে সেখানে। গেলে সুখী হবি।

—সত্যি বলছিস্?

—হ্যাঁ, সত্যি।

—তুই কোনদিন গিয়েছিস সেখানে?

—না, আমাদের ভাগ্যে এখনো যাওয়া ঘটে ওঠে নি। আমরা যে পাপী।

—পাপী কেন হবি। ঐ বলে বলে ত আমরা নষ্ট হতে চলেছি। ভারতের অধঃপতন হচ্ছে ঐ পাপ পাপ করে আর ধর্মের ধ্বজা তুলে······

—চুপ কর, ও কথা আর বলিস না। হরিদ্বারে গিয়ে একথা বললে তোকে আর আস্ত রাখবে না। যা বলেছিস্ বলেছিস্ আমার কাছে। অন্যলোকের কাছে একথা বলিস নি।

—কেন বলবো না। ভারতের ধর্ম এতদিন জাতিকে কি দিয়েছে? তাদের বৈষয়িক দুঃখ দূর করতে পেরেছে?

—ওসব বড় বড় তর্ক করা আমার দ্বারা সম্ভবে না। তুই যদি আশ্রমে না যাস্ ত ঘরে থাক। বিয়ে থা করে সংসারী হ'।

শচীকান্ত বললে, আমি বিয়ে করবো না, সন্ন্যাসীও হবো না। আমি অবিবাহিত থেকে দেশের কাজ করবো—

—কেন, যারা দেশসেবা করে তারা বুঝি বিয়ে করে না।

—করে, কিন্তু আমার কথা অন্য।

—অন্য নয়, তোকে বিয়ে করতেই হবে। ওসব পাগলামী রাখ। আসছে রবিবারের জন্যে তৈরী হয়ে থাকিস। আমি এসে তোকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবো। তখন কোনরকম অমত বা গররাজীর কথা আমি শুনবো না।

শচীকান্তকে একপ্রকার শাসানোর সুরে কথাগুলি বলে জয়া চলে

গেল। সে ও পাড়াতেই থাকে। কি একটা কাজে তার উপস্থিতি বিশেষ প্রয়োজন বোধ করে আর দেরী না করে তাড়াতাড়ি সরে পড়লো।

শচীকান্ত বাজারের শূন্য ব্যাগ্ দোলাতে দোলাতে রঙীন স্বপ্নে বিভোর হয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসংগীতের একটা কলি গাইতে গাইতে বাজারের কাছে এলো।

জয়ার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আজ একটু দেরী হয়ে গেছে। তাই তার চেনাশুনা লোকটি আনাজগুলি বিক্রী করে উঠে গেছে। তার দেখা পেলো না। অন্য একটা অচেনা লোকের কাছ থেকে কিছু আনাজ কিনে বাসায় ফিরে এলো।

পাঁচ

চৈত্র মাস। মধু ঋতুর দ্বিতীয় মাস। আজ রবিবার। দিনটি বেশ সুন্দর বোধ হচ্ছে। নির্মেঘ নিলীমার বুকে প্রভাতরবির শান্তস্নিগ্ধ উজ্জ্বল হাসির ছটা পড়েছে। দেখে মনে হচ্ছে এ দৃশ্য শুভদিনেরই ইঙ্গিত। শচীকান্তর ভাগ্যাকাশে অনাগত দিনের শুভ-লগ্ন আসছে। সে হয়ত সুখী হবে আজীবনের জন্যে। কিন্তু মানুষ যা ভাবে তা কি কখনো সফল হয়? তাই যদি হোত তাহলে সংসারে দুঃখ বলে কিছু থাকতো না।

দেওয়াল ঘড়িতে সকাল সাতটা বাজার শব্দ শুনতে পেল শচীকান্ত। এর আগেই তার ঘুম ভেঙেছে। আজ কেমন সকাল সকাল সে শয্যা থেকে উঠে পড়েছে। ভাবতেও পারেনি আজ ওর ঘুম এত সকালে ভাঙবে। ভোর পাঁচটার সময় একবার উঠেছিল। পরে ঘড়ির দিকে চেয়ে আবার শুয়ে পড়েছে। আর গভীর ঘুম আসে নি। বসন্ত প্রভাতের হিমেল হাওয়ায় কেমন যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিল তার সর্বশরীর। বিছানায় নামেমাত্র শুয়েছিল। মনটা ছিল সজাগ। তাই জয়া এসে যখন তার ঘরের দরজায় কড়া

[ভ]াঙলে ও ধড়মড়িয়ে উঠে পড়লো। কোনরকম জিজ্ঞাসাবাদ না [ক]রেই দরজা খুলে দিলে।

ঘরে ঢুকেই জয়া শচীকান্তকে বললে, আজ দেখছি, অন্যদিনের [চে]য়ে আগেই ঘুম ভেঙেছে। আজ রবিবার। আরও বেশী করে [ঘু]মোন উচিত ছিল। কিন্তু—

শচীকান্ত রসিকতা করে বললে, কিন্তু ত জানিস ভাই। কেন [আ]বার মিথ্যে ছলনা করছিস।

জয়া মৃদু হেসে তার নরম সুগোল গালটি টিপে ধরে বললে, [বু]ঝেছি, আজ যে জীবনের বড় শুভদিন। আজ এমনিতেই ঘুম [ভে]ঙে যাবে সে আমি জানতুম। আমার ডাকতে আসাই বৃথা হলো।

—কেন বৃথা হবে? তুই না এলে আমি আরও অনেকক্ষণ [বি]ছানায় শুয়ে থাকতুম।

—তাই নাকি? কার চিন্তায় শুয়ে শুয়ে কড়িকাঠ গুণতিস্?

—তা বলবো কেন?

—বুঝেছি, রমার চিন্তায়। মুচকি হেসে বললে জয়া।

শচীকান্ত বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে জয়ার মুখের দিকে তাকিয়ে [শু]ধালো, রমা কে?

—তোর ভাবী বৌ রে—ভাবী বৌ। যাকে আজ দেখতে [যা]চ্ছিস্।

—তাই নাকি?

হ্যাঁ। বলি তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নে। আর ন্যাকা সাজতে হবে না। মনে ষোল আনা ইচ্ছে আছে মেয়ে দেখার তবু মুখে বলবি না।

—এ জিনিস কি বলা যায়? এ যে অনুভবের জিনিস।

—তা আমি ভালভাবেই জানি। তবু পুরুষরা কিছুটা প্রকাশ করতে জানে।

—আমি ত বলেছি তোদের, আমি এসব ঝামেলা ভালবাসি না। বেশ একলা নির্ঝঞ্ঝাটে থাকবো। তা নয় আমার ঘাড়ে একটা বোঝা চাপানো কেন?

—এ বোঝা নয়, এ তোর সুখের পারিজাত। বিয়ের আগে সকলের এই রকমই মনে হয়। তারপর সব চুপচাপ। আগের মত সাধারণ হয়ে যায় জীবন।

—রাখ তোর ওসব তত্ত্বকথা। আমার ওসব শুনতে ভাল লাগে না।

জয়া আর কোন কথা বললে না। রেডিওতে সানাই বাজ্‌ছিলো। একমনে তাই শুনতে লাগলো।

শচীকান্ত ঘর থেকে বেরিয়ে কলঘরে গেল।

বকুলরাণী ঘরে এসে জয়াকে দেখে বললেন, তুমি কখন এলে ?

জয়া বললে, এইমাত্র। পরে প্রণাম করে বললে, মাসীমা, আজ আমরা রমাকে দেখে আসি। আপনি আশীর্বাদ করুন। শচীকান্তর যদি মেয়ে পছন্দ হয়ে যায় তাহলে বিয়ের দিনটা একেবারে পাকা করে ফেলবো।

বকুলরাণী ধীরে ধীরে বললেন, সেত উনি করবেন। তোমরা শুধু মেয়ে দেখে এসো।

জয়া ঘাড় নেড়ে বললে, তাই হবে। ঠিক বলেছেন। দেনা-পাওনার কথা বা বিয়ের দিন ঠিক করার ভার বর ও কনেকর্ত্তার ওপর, আমাদের মত ছেলেছোকরার কাজ ও নয়। আমরা কেবল রমাকে দেখে আসবো।

—হ্যাঁ বাবা, তাই এসো।

বকুলরাণী আর দাঁড়ালেন না। পাশের ঘরে এসে ঠাকুরপ্রণাম করলেন। শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ ও চৈতন্যের পট। জগন্নাথেরও একটা পট রয়েছে। কাঠের ওপর খোদাই করা মা লক্ষ্মীর প্রতিমূর্ত্তি একটা ব্র্যাকেটের ওপর হেলান দিয়ে রাখা হয়েছে। তার সামনে পেতলের ছোট ঘট। পাশে একটা সামুদ্রিক কড়ি। একটা ছোট আয়না। একটা চিরুণী। একটা হরতুকী। ঘটের মুখে রূপোর তৈরী পঞ্চপল্লব বিশিষ্ট আমের ছোট একটি শাখা। ঘটের গায়ে ও আয়নার ওপর সিঁদুর লেপা।

গলায় আঁচল দিয়ে ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করলেন বকুলরাণী। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানালেন, শচীকান্তর ভাগ্য ফিরিয়ে দাও। ও যেন সংসারী হয়। সন্ন্যাসী কোরো না।

সেদিন ঠাকুর বকুলরাণীর কথায় কর্ণপাত করেছিলেন কিনা জানিনা তবে অলক্ষ্যে একটু ক্রূর হাসি হেসেছিলেন।

প্রণাম করে পাশের ঘরে এলেন বকুলরাণী। জয়াকে বললেন, তুমি বসে থাকো। আমি চা করে আনছি।

রান্না ঘরে চলে এলেন বকুলরাণী।

শচীকান্ত তোয়ালে মুখ মুছ্‌তে মুছ্‌তে ঘরে এলো। জয়াকে বললে, মা তোকে কিছু বললে?

জয়া ফিক্ করে হেসে বললে, মাসীমা বললেন, আজই বিয়েব ব্যবস্থা পাকা করে আসতে।

শচী নাক সিঁটকে চোখদুটি ঈষৎ বক্র করে বললে, এ্যাঁ—আবদার আর কি! বিয়ে কি এত সহজে হয়। কথায় আছে না, লাখো কথায় বিয়ে হয়। বলতে বলতে শচীকান্ত মুখের ওপব বারবার তোয়ালে ঘসতে থাকে।

জয়া বললে, থাক, হয়েছে। তাড়াতাড়ি নে। অত সাজ-গোজের দরকার কি! আজ ত বিয়ে করবি না।

—যা! যত সব ইয়ারকি! জয়ার কাছে এসে বললে, দেখতো, আজ দাড়ি কামাতে হবে কিনা? কাল ত একবার দাড়ি কামিয়েছি।

জয়া শচীকান্তর গালে হাত বুলিয়ে বললে, না, কামানোর দরকাব নেই। এই বেশ আছে। সামান্য হেসে কৌতুক করে বললে, তুই ত আর বুড়ো নস্ যে পাকা দাড়ি ঢাকবার জন্যে দশবার কামাবি।

শচীকান্ত হো হো শব্দে হেসে উঠলো। বললে, না কামালে কোন ক্ষতি হবে নাতো?

জয়া আত্মবিশ্বাসের ওপর জোর দিয়ে বললে, না—না। কোন ক্ষতি হবে না। ঐ বেশ আছে।

জয়ার কথায় শচীকান্তর মন ভিজলো না। কি মনে ক
সাবান আর ক্ষুর নিয়ে লেগে গেল কামাতে।

জয়া বিরক্ত হয়ে বললে, না, তোকে নিয়ে আর পারি না

রেডিওতে একটা ভাল রবীন্দ্রসংগীত হচ্ছে—"সম্মুখে শান্তি
পারাবার—"

জয়া মন দিয়ে শুনছে। এমন সময় বাণীপ্রসাদ এলেন।

জয়াকে দেখে বললেন, তুমি এসেছ?

জয়া তখুনি চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে বাণীপ্রসাদকে প্রণাম
করলো।

বাণীপ্রসাদ বললেন, থাক, হয়েছে, তুমি বোস।

জয়া বললে, না, আপনি বসুন।

—আমি বসবো না। আমার সময় নেই। এখুনি আমাকে
কলে বেরুতে হবে। তোমাকে ছু'একটা কথা বলে যাই।

—বলুন।

—একটু বাইরে এসো। বাণীপ্রসাদ জয়াকে সঙ্গে করে পাশের
ঘরের বায়ান্দায় এলেন।

শচীকান্ত দাড়ি-কামানোয় ব্যস্ত।

বাণীপ্রসাদ বললেন, তুমি ভাল করে দেখে এসো মেয়েকে
এসে বলবে, কেমন দেখলে। যদি মেয়ে মনোমত হয় তারপর বিয়ের
ব্যবস্থা করা যাবে। তোমার ওপর আমি ভরসা করে আছি।

জয়া হাতের মধ্যে হাত দিয়ে কচলাতে কচলাতে মৃদু হেসে
বললে, তা আপনি যা বলবেন তাই হবে। আমার সাধ্যমত আমি
করবো। শচী ত আমার সঙ্গে যাচ্ছে। ওর পছন্দ হলে বিয়ে কি
আর আটকায়!

বাণীপ্রসাদ ভারিক্কি গলায় বললেন, তাহলেও তুমি একবার
মেয়েকে যাচাই করে দেখো। শচী বোকা ছেলে। ও সাদাসিধে
মানুষ। ও ভাব নিয়ে দুনিয়ার বাজারে চলা বড় শক্ত।

জয়া আর কোন কথা বললে না। বাণীপ্রসাদকে প্রণাম

করলো। বললে, আশীর্বাদ করুন। আমাদের যাত্রা যেন সফল হয়।

বাণীপ্রসাদ নিচে নেমে গেলেন। এখুনি তাঁকে কলে বেরুতে হবে। মেয়ে বেলাকে ডেকে বললেন, বেলা, আমার ব্যাগ্‌টা ওপর থেকে নিয়ে আয় ত।

বেলা ব্যাগ নিয়ে এলো। বললে, চা খাবে না ?

বাণীপ্রসাদ বললেন, তারতো অনেক দেরী।

বেলা বললে, মা ত দাদাদের জন্যে চা তৈরী করছে। আমি যাই—দেখে আসি একবার—তুমি একটু দাঁড়াও—

বেলা দৌড়ে রান্নাঘরে চলে এলো। নিচেই রান্নাঘর। চা হয়ে গেছে। বেলা তাড়াতাড়ি এককাপ চা এনে বাণীপ্রসাদের হাতে দিল।

বাণীপ্রসাদ চায়ে চুমুক দিয়ে আরামের নিশ্বাস ফেললেন। হাতে সময় নেই বেশী। তাই ঐ গরম চা তাড়াতাড়ি খাওয়া হলো না। কাপে দু'চার চুমুক দিয়ে বাকী চা বেলাকে দিয়ে দিলেন।

বেলা বললে, আর খাবে না ?

—না।

বাণীপ্রসাদ চলে এলেন বাইরে। হাতে-টানা রিক্সা ডেকে তাতে উঠে পড়লেন।

বেলা চায়ের কাপ হাতে করে পিতার রিক্সার প্রতি তাকিয়ে রইলো খানিকক্ষণ। গলির মোড়ে রিক্সা অদৃশ্য হলে সদর দরজা বন্ধ করে রান্নাঘরে চলে এলো। আসার সময় কাপের বাকী চাটুকু এক চুমুকে গিলে ফেললো। তখনো চা একেবারে ঠাণ্ডা হয় নি।

ছয়

রিক্সায় করে যেতে যেতে বাণীপ্রসাদ ভাবলেন অনেক কথা। তাঁর বড় ছেলে সুধাকান্তর বিয়ের কথা।

সুধাকান্তও শচীকান্তর মত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। নিজে মেয়ে দেখে নি। বাণীপ্রসাদ সরল বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে যাকে ভাল বলে বুঝেছিলেন তার সঙ্গে সুধাকান্তর বিয়ে দিলেন।

পরে ও মেয়ে নাকি সুধাকান্তর মনোমত হয় নি। বিয়ের কয়েকদিন পরে কয়েকটি কুলক্ষণে তা বুঝতে দেরী হয় নি বাণীপ্রসাদের। আর মঞ্জুষার কথাবার্তাও কেমন যেন তিরিক্ষি মেজাজের। হাবভাব চালচলন রুক্ষ। দেখে মনে হয়, ভগবান পুরুষ সৃষ্টি করতে গিয়ে ভুলবশতঃ নারী সৃষ্টি করেছেন।

কেবল তাই নয়, মঞ্জুষা সুধাকান্তকে অনেকবার জপিয়েছে, চলো, এ সংসার ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাই। আলাদা থাকি।

সুধাকান্ত রাজী হয় নি।

মঞ্জুষাও আর কোন কথা বলে নি। তার স্বামীকে ঠিক ঠিকভাবে এখনো গ্রহণ করতে পারে নি। মেজাজে আসে নি কোমলতা যদিও সে সন্তানের জননী।

বাণীপ্রসাদের কানে কর্কশভাষিণী মঞ্জুষার কর্কশ ভাষণ অনেকবার লক্ষ্যে অলক্ষ্যে পৌঁছেচে। তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নি। মাঝে মাঝে ভগবানকে উদ্দেশ করে গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাসের সঙ্গে বলেছেন, হায় ভগবান, সরল বিশ্বাসের এই পরিণাম!

সরল বিশ্বাসের ওপর নির্ভর করে নিজে জীবনে একবার ঠকেছেন। তাই ওরকম ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না হয় সেইজন্যে বাণীপ্রসাদ এবার কেবল নিজে রমাকে দেখে ক্ষান্ত হলেন না। ছেলে ও পাত্র শচীকান্তকে পাঠালেন পাত্রীকে দেখতে। সঙ্গে সুচতুর ও কবিবন্ধু জয়াকেও পাঠালেন। কারণ তাঁর বিশ্বাস, কবিরা সরল বিশ্বাসী হলেও তাদের দৃষ্টি অন্তর্ভেদী। মানুষের অন্তরের ছবি তারা দেখতে পায়। এবার হয়ত জয়ার দ্বারা তাঁর পূর্বকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হতে পারে।

এইসব নানা ভাবনা এসে তাঁর কাছে হাজির হলো। ওদিকে রিক্সাওলা নির্দিষ্ট বাড়ী ছেড়ে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেল।

সেদিকে ডাক্তার বাণীপ্রসাদের হুঁশ নেই। চিন্তাচক্রে তাঁর মন ও বুদ্ধি ঘূর্ণিত।

ওদিকে যথারীতি জলযোগ সেরে শচীকান্ত মাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লো জয়ার সঙ্গে।

সুধাকান্ত আজ বাজারে গিয়েছে। অন্যদিন শচীকান্তই বাজার করে। আজ সে অন্য জায়গায় যাচ্ছে। সময় নেই। তাছাড়া রবিবারদিন এলে সুধাকান্ত প্রায়দিন বাজারে যায়। ভাইকে বলে, তুই ত রোজ বাজার করিস। আজকের দিনটা আমি বাজারে যাই।

শ্যামবাজারের মোড়ে এসে দাঁড়িয়েছে দুই বন্ধু। ডবলডেকারে চেপে বালীগঞ্জে আসবে। ওখান থেকে গড়িয়ার বাসে চাপবে।

শচীকান্ত কৌতুকী-হেসে বললে, ট্যাক্সি কর। বাসে যাবো না।

জয়া বললে, আজকে না। ফ্যাইনাল্ দিনে তোকে ট্যাক্সি করেই নিয়ে যাবো।

শচীকান্ত হাসলো।

তারপর জয়া ওর মনে আরও আনন্দ দেবার জন্যে কবিগুরুর মানসী কাব্যগ্রন্থ হতে একটি কবিতার কয়েক ছত্র আবৃত্তি শুরু করলো,— "......বুঝি বা তীরে উঠিয়াছে সে
জলের কোল ছেড়ে।
ত্বরিত পদে চলেছে গেহে,
সিক্ত বাস লিপ্ত দেহে—
যৌবন লাবণ্য যেন
লইতে চাহে কেড়ে।
মাজিয়া তনু যতন ক'রে
পরিবে নব বাস।
কাঁচল পরি আঁচল টানি
আঁটিয়া লয়ে কাঁকনখানি
নিপুণ করে রচিয়া বেণী
বাঁধিবে কেশপাশ।......"

শচীকান্ত মুখভরা দীপ্ত হাসি নিয়ে শুধোলে, এ কার কবিতা রে?

—কেন, একি বলে দিতে হবে! শুনে বুঝতে পারছিস্ না কার কবিতা!

শচীকান্ত ভ্রূযুগল সঙ্কোচন করে একটু ভাবলে। তারপর বললে; কবিগুরুর?

—হ্যাঁ। তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ মানসীর 'অপেক্ষা' কবিতা থেকে বললুম।

শচীকান্তর মনে সত্যিই দোলা জাগিয়েছে ঐ কবিতা। বিনয়ের সুরে বললে, আর একবার আবৃত্তি কর না ভাই শুনি। খুব ভাল লাগছে। যেন ঘুম আসছে—

জয়া গালদুটো ফুলিয়ে বললে, হুঁ! যদি বাস ফেল করি?

—পরের বাসে যাবি।

—মাইরী আর কি। ওদিকে তোর আসল মানসী সেজেগুজে বসে থাকবে। ঠিক সময়ে না গেলে বিরক্ত হবে যে।

শচীকান্ত এবার জেদ ধরে বললে, আমি তোর ওসব কথা শুনছিনা। তোকে বলতেই হবে······

হাত ধরে টানাটানি লাগিয়ে দিলে শচীকান্ত।

পাশে দু'চার জন যাত্রী বাসস্টপে এসে অপেক্ষা করছে বাসের জন্যে। তাদের মধ্যে দু' একজন শচীকান্তর মুখের দিকে একবার বক্রনয়নে তাকাল।

জয়া তা লক্ষ্য করলো। বললে শচীকান্তকে, জানিস, এটা রাস্তা। এখানে মানসীর কবিতা আওড়ানোর জায়গা নয়। আমি আর কিছু বলতে পারবো না।

শচীকান্ত নাছোড়বান্দা। বললে, না তোকে বলতে হবে। এই তোর হাত ধরলুম। এবার না বললে পা ধরবো······

অসহায়ভাবে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকালো জয়ার মুখের দিকে।

জয়া উপায়ন্তর না দেখে আবৃত্তি করলো,—

"...বাজিবে তার চরণধ্বনি
বুকের শিরে শিরে।
কখন, কাছে না আসিতে সে
পরশ যেন লাগিবে এসে
যেমন করে দখিণবায়ু
জাগায় ধরণীরে।
যেমনি কাছে দাঁড়াব গিয়ে
আর কি হবে কথা?
ক্ষণেক শুধু অবশকায়
থমকি রবে ছবির প্রায়,
মুখের পানে চাহিয়া শুধু
সুখের আকুলতা।
দোঁহার মাঝে ঘুচিয়া যাবে
আলোর ব্যবধান।
আধারতলে গুপ্ত হয়ে
বিশ্ব যাবে লুপ্ত হয়ে,
আসিবে মুদে লক্ষকোটি
জাগ্রত নয়ান।"......

শচীকান্ত লাফিয়ে উঠে বললে, বা! বা! বেশ সুন্দর ত—আর একটু—

জয়া বাধা দিয়ে বললে, না। আজ থাক। অন্যদিন হবে। তোর জন্যে তুটো বাস ফেল করলুম। হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললে, বেলা ন'টা বাজতে চললো। অনেক দেরী হয়ে গেছে। এখান থেকে যেতেই ত এক ঘণ্টা সময় নেবে।

হুঁ...হুঁ...উ...উ...উ ঘড়্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে দৈত্যের মত শরীর নিয়ে ডবল্‌ডেকার বাস এসে হাজির। জয়া শচীকান্তর হাত ধরে বাসে উঠে পড়লো।

ওপরে গিয়ে বসলো তু'জনে।

সাত

তেজেন্দ্রবাবু আগে থেকেই বাড়ীর ঠিকানা ও পথের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সুতরাং জয়ার বেশী কষ্ট হয় নি বাড়ী চিনতে।

সাউথ্ গড়িয়া রোডের ধারেই বাড়ী। তিনতলা হলদে বাড়ী। ওপরে ঝোলানো বারান্দা। বাড়ীর সামনে ছোট লন। নিচে তিন খানা ঘর। ওপরে ছু'খানা আর তিন তলায় একখানা। তার পাশে আর একটি ছোট প্যকেট ঘর। সেটি পূজাঘর হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

নিচের তিনটি ঘরের মধ্যে একটা বৈঠকখানা। একটায় থাকে রমার দাদা অমলাংশু। আর একটায় চাকর থাকে। দোতলায় ছু'খানা ঘরের মধ্যে একটায় থাকেন তেজেন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী সুধাময়ী, অপরটিতে রমা। তিনতলার ঘরটা খালি পড়ে আছে। কোন আত্মীয়স্বজন এলে থাকে। একতলা ও দোতলায় কল-পাইখানা। রান্নাঘর দোতলায়। বাড়ীর ছু'দিকে সিঁড়ি। ভেতরের সিঁড়ি সিমেণ্টের। তার ওপর মেজাক্ করা। বাইরের সিঁড়ি লোহার। ঘোরানো। জমাদার ও চাকরবাকরদের ব্যবহারের জন্যে তৈরী হয়েছে।

দোতলা ও তিনতলার ঘরের মেজে মোজাক্ করা। একতলার মেজে লাল সিমেণ্ট দেওয়া।

বাড়ীতে ঢুকতেই চোখের সামনে দেওয়ালের ওপর আঁটা একটা সাদা মার্বেল পাথরের টুকরো পড়বে। তার গায়ে লেখা আছে **'পদ্মপলাশ'।**

জয়া কবি মানুষ। ঐ লেখাটি পড়ে তার মনে কেমন যেন কৌতূহল জাগলো। মনে মনে আলোড়ন চললো ঐ কথার তাৎপর্য জানবার জন্যে। কিন্তু খুঁজে পেল না অর্থ।

পদ্মপলাশের অর্থ অত্যন্ত নিগূঢ়। পদ্ম গুণময় আর পলাশ

নির্গুণ। সংসার গুণ আর নির্গুণের সমাহার। তাই তেজেন্দ্র বাড়ীর নাম ওরকম রেখেছেন।

বাইরের ঘরে ভেজানো দরজায় কড়া নাড়তে একজনের গলা শোনা গেল। লোকটি হিন্দুস্থানী বলে মনে হলো।

বললে, কে আছেন?

পরে দরজা খুলতে এক বৃদ্ধকে দেখতে পেল জয়া। বাহাত্তুরে বৃদ্ধ। হিন্দুস্থানী। পলিতকেশ। শীর্ণ। ভাঙা বাংলা ও হিন্দী বলতে পারে।

জয়াকে জিজ্ঞেস করলো, কাকে চান?

জয়া বললে, কর্ত্তাবাবু আছেন?

হিন্দুস্থানীটি বললে, হ্যাঁ আছেন। আপনারা কোথা হতি আসেন?

জয়া বললে, আহিরীটোলা থেকে।

হিন্দুস্থানীটি মুখটা স্ফূর্ত্তিতে রাঙিয়ে বললে, ও, এবার বুঝেছি। বাবু হামাকে বলেছেন, এক ওউর দোবাবু উধার সে আয়েঙ্গা।

জয়া বললে, তুমি এখানে কি করো?

—হাম্ কাঠকা গুদামমে কাম্ করতা হুঁ।

—তোমার নাম?

—হরি সিং।

জয়া আর কোন কথা জিগ্যেস করলো না। বেশ বুঝতে পারলো হরি সিং আর কেউ নয়, তেজেন্দ্রবাবুর কাঠ-গোলার দারোয়ান।

হরি সিং হাত-পা নেড়ে বললে, আপলোক উপরমে যাইয়ে। বাবু আউর এক আদ্‌মিভি উপরমে হ্যায়।

জয়া দেরী না করে ওপরে এলো শচীকান্তকে নিয়ে। নিচেয় কথাবার্ত্তার কিছুটা ওপরে পৌঁছেচে। তেজেন্দ্র জানতে পারলেন, নিশ্চয়ই কেউ এসে থাকবে। হরি সিংএর ভারি গলা তাই জানালো।

তিনি শুভঙ্করের সঙ্গে কথা বন্ধ করে ঘর থেকে উঠে এলেন। সিঁড়ির ধারে এসে এক-পা বাড়িয়ে হরি সিংকে ডাকতে যাবেন এমন সময় জয়াকে দেখতে পেলেন।

জয়া করযোড়ে বললে, নমস্কার।

শচীকান্ত ও তার সঙ্গে নমস্কার জানালো।

তেজেন্দ্র প্রতি নমস্কার জানিয়ে বললেন, আপনারা কোথা থেকে আসছেন ?

জয়া বললে, আহিরীটোলা থেকে।

ও-হো, বলে বিশেষ আগ্রহভরে জয়া ও শচীকান্তকে অভ্যর্থনা জানালেন তেজেন্দ্র। উভয়কে ঘরে নিয়ে গিয়ে সুসজ্জিত শোফায় বসতে বললেন।

জয়া পরিচয় করিয়ে দিলো শচীকে তেজেন্দ্রর কাছে। নিজেরও পরিচয় দিলে। বললে, আমি শচীকান্তর বাল্যবন্ধু।

তেজেন্দ্রও শুভঙ্করের সঙ্গে জয়া ও শচীর পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, শুভঙ্কর বেশ ভাল ছেলে। ও একজম কবি ও শিল্পী। অমলাংশু ও রমার বন্ধু।

তারপর চুরুটে একটি দীর্ঘ টান দিয়ে বললেন, শুভঙ্কর রমাকে ঠিক ঠিক জানে। তাই আজকের ইণ্টারভিউয়ে রমার যাতে কোন অসুবিধে না হয় তার জন্যে ওকে ডেকে এনেছি।

জয়া মুচকী হাসলো।

তারপর তেজেন্দ্র জয়াকে বললেন, আপনারা একটু বসুন রমাকে এখনি ডেকে দিচ্ছি। চোখের দু'কোণে হাসির পুঁটলি খুলে বললেন, আমি কিন্তু এ ইণ্টারভিউয়ে থাকছি না।

সকলের উচ্চহাসিতে ঘরের নিস্তব্ধতা ভেঙ্গে গেল।

কিছুক্ষণ পরেই তেজেন্দ্র রমাকে সঙ্গে করে এনে ঘরে প্রবেশ করলেন।

রমা এসে একটা ছোট শোফায় বসলো। তেজেন্দ্র ঘরের বাইরে চলে এলেন

রমার মনে ও দেহে যতটুকু আড়ষ্টতা ছিল তা শুভঙ্করকে দেখে ভেঙ্গে গেল।

মুখ নীচু করে বসে রইলো সোফায়। লম্বা মিশকালো চুলে খোঁপা বাঁধে নি। বিনুনী করে ছড়িয়ে দিয়েছে পিঠে। কানে পরেছে মনিপুরী মাক্‌ড়ী। হাতে কাঁকন। গলায় একটা চেন হার। এককথায় প্রসাধন ও আভরণ অতি সাধারণ করেছে। নিজের অকৃত্রিম রূপলাবণ্যকে ঢাকবার জন্যে কৃত্রিম সাজসজ্জার আশ্রয় নেয় নি রমা। সুধাময়ী বরং বলেছেন, অমুক চুরি পর, অমুক শাড়ী পর। রমা মার কথা শোনে নি। লোকে তাকে দেখতে এসেছে আসুক। দেখে যাক, তার নিরাভরণ রূপ। তাতেই তার আনন্দ। সরলতার মধ্যে মানব চরিত্র দীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠে। অমন সুন্দর খাইমুখ, পাতলা ছোট্ট ঠোঁট, ছোট্ট পাতলা কান, চুলঢাকা ছোট্ট কপাল, জোড়া ভ্রূ, টানাটানা কুচ্‌কুচে কালো পল্লব-ঘেরা চোখ, মানানসই নাক, দুধে আলতা রঙ্‌ কটা মেয়ের আছে?

রমা অমনিভাবে মুখনীচু করে বসে আছে।

শুভঙ্করের কাছে এ ব্যাপারটা বড় বিসদৃশ লাগলো। সে রমাকে বললে, মুখটা তুলে বসো।

রমা ঈষৎ মুখ তুললো।

শুভঙ্কর জয়ার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললে, আপনারা এবার প্রশ্ন করতে পারেন।

জয়া নড়েচড়ে বসে আরম্ভ করলো বলতে, আপনার নাম কি?

রমা বললে, মিস্‌ রমা মিত্র।

—আপনি কতদূর পর্যন্ত পড়েছেন?

—আই-এ পাশ করেছি।

—আপনি রবীন্দ্রনাথকে জানেন?

—কে, কবি রবীন্দ্রনাথ?

—হ্যাঁ।

—নিশ্চয়ই জানি।

—তাঁর কোন্ কবিতার বই আপনার বড় ভাল লাগে?

—গীতাঞ্জলি।

—কেন মানসী?

—জানি না।

জয়া শচীকান্তর গা ঠেলে বললে, তুই এবার প্রশ্ন কর। তোর যখন জিনিস তখন একবার বাজিয়ে নে।

শচীকান্ত লজ্জায় মরে যেতে লাগলো। মুখে কথা ফুটলো না। জয়ার পিঠের দিকে মুখ করে বসে রইলো। মিঠে হাসির আবরণে মুখ ঢাকলো।

জয়া আরম্ভ করলো রমাকে প্রশ্ন করতে, বলুন ত,

"বৃথা এ বিড়ম্বনা!

কিসের লাগিয়া এতই তিয়াষ,

কেন এত যন্ত্রণা!……

এ কার কবিতা?

রমা উত্তর দিলো না। নীরব রইলো।

শুভঙ্কর তাকে সাহায্য করলো? বললে, বলোনা রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র কবিতা—নাম—'মায়া'।

একঝলক মৃদু অস্পষ্ট হাসির রেখা ফুটে উঠলো গোলাপ পাপড়ীর মত রমার পাতলা লাল ঠোঁট দুটিতে।

এবার লজ্জা পেয়েছে সে। শাড়ীর আঁচলটা নিয়ে মুখের ওপর চেপে ধরে শুভঙ্করের দিকে একলহমায় তাকিয়ে নিলো।

ওদিকে তেজেন্দ্র আর সুধাময়ী ভেজানো জানলার ফাঁক দিয়ে মেয়ের ইন্টারভিউ দেখছেন।

তেজেন্দ্র বললেন, দেখলে ত এবার। বুঝলে, কেন শুভঙ্করকে ডেকেছিলুম। তুমি ত বাদ সাধছিলে।

সুধাময়ী বললেন, বেশ করেছ ডেকেছ।

—তবে? বললেন তেজেন্দ্র।

সুধাময়ী বললেন, আঃ আস্তে! ওঁরা শুনতে পাবেন যে।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনে পালা করে দেখতে লাগলেন ইণ্টারভিউ চিত্র। একবার স্বামী দেখেন ত স্ত্রী নিরস্ত হন, আর একবার স্ত্রী দেখেন ত স্বামী নিরস্ত হন।

শুভঙ্কর রমার দিকে একবার তাকিয়ে জয়ার দিকে বক্র দৃষ্টি-শর হানলো। তার চাহনির মধ্যে জীবনে অনেকরকম চাওয়া-পাওয়ার দ্বন্দ্ব লাফালাফি করতে লাগলো। জয়াও আড়চোখে তা লক্ষ্য করলো।

হ্যাঁ শুভঙ্করের রাগ হবে বৈকি! শুভঙ্কর শুধু রমার বন্ধু নয়, ভাবী আরও কিছু।

জয়া রমাকে জিগ্যেস করলে, আপনি রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলি পড়েছেন?

রমা বললে, হ্যাঁ।

—আবৃত্তি করুন ত একটা কবিতা।

রমা আবৃত্তি করলে,

"জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো।
সকল মাধুরী লুকায়ে যায়,
গীতসুধারসে এসো।
কর্ম যখন প্রবল-আকার
গরজি উঠিয়া ঢালে চারি ধার
হৃদয়-প্রান্তে হে নীরব নাথ,
শান্ত চরণে এসো।......"

রমা শেষের স্তবকটি বলতে যাচ্ছিল।

জয়া বললে, থাক্, আর বলতে হবে না।

জয়া এবারও শুভঙ্করের কটাক্ষ লক্ষ্য করলো। শচীকান্তও বুঝতে পেরেছে শুভঙ্করের মন হিংসায় পূর্ণ। ঔদ্ধত্যে নিম্নগামী। ও পোষাক-আশাকে যত ভদ্র হোক না কেন ওর অন্তরে রয়েছে একটা জাগ্রত বন্য জন্তু আদিম প্রবৃত্তি নিয়ে।

শুভঙ্করের চেহারা তত উজ্জ্বল নয়। কিন্তু পোষাকে তাকে সুন্দর করেছে।

রোগা ছিপ্‌ছিপে গড়ন। চোয়াল উঁচু, গাল বসা। কপালের শিরা বেরিয়ে গেছে। মাথায় টাক। থুত্‌নি লম্বা। কোটরগত বড় বড় চোখ। মুখের রূপ দেখে মনে হয় ঘোটকও লজ্জা পাবে।

পরণে সেনগুপ্তর ধুতি। আর্দির গিলে করা পাঞ্জাবি। ঘাড়ে গলায় ও কানের পাশে পাউডার দেখা যাচ্ছে। চোখে একটা রোল্ড্‌গোল্ডের চশ্‌মা। জামায় এসেন্স দিয়েছে খুব। মনে হয় জলের বদলে এসেন্সে চান করে এসেছে।

জয়া আর কোন প্রশ্ন জিগ্যেস করলো না রমাকে। এবার বললে, আপনি এবার যেতে পারেন।

রমা উঠে গেল। শুভঙ্কর স্বচ্ছদৃষ্টিতে রমার দিকে তাকিয়ে একটা লঘু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললে।

জয়ার কানে তার ক্ষীণ শব্দটুকু পৌঁছলো।

মৃদু হেসে জয়া শুভঙ্করকে বললে, এবার আপনার সঙ্গে একটু আলাপ করা যাক।

শুভঙ্কর বড় বড় দু'পাটি দাঁত বের করে চাপা হাসির ফোয়ারা মুখময় ছড়িয়ে বললে, হেঁ হেঁ আমি আর এমন কি লোক—হেঁ···হেঁ···

জয়া বললে, তা হোক। যে গুণী সে কি কখনো নিজের গুণের বড়াই করে?

শুভঙ্কর নিশ্চুপ।

জয়া বললে, আপনি নাকি কবি ও শিল্পী?

শুভঙ্কর হাত কচ্‌লাতে কচ্‌লাতে বিনয় করে বললে, না—সামান্য সাদা কাগজে দু'চার কলম লিখি আর দু'চারটে আঁক কাটি—

—তা হোক, তবু ত আপনার আর্টের গুণ আছে। আমাদের ত তাও নেই।

এবার শুভঙ্করের বুকটা গর্বে চার ইঞ্চি ফুলে উঠলো। শোফায় বেশ করে গুছিয়ে বসে আরামের নিঃশ্বাস ফেলে বললে, আপনি কি করেন?

—আমি ব্যাঙ্কে কাজ করি।

এরপর আরও দু'চার কথা হলো শুভঙ্করের সঙ্গে জয়ার। জয়া বেশ বুঝতে পারলো, শুভঙ্কর কবি ও শিল্পী হতে পারে কিন্তু তার মনটা পরিষ্কার নয়।

অমলাংশুর সঙ্গে জয়ার পরিচয় হলো।

অমলাংশু রসিয়ে রসিয়ে শুধোলে, মেয়ে পছন্দ হলো?

জয়া বললে, আমি আর কি বলবো বলুন। পাত্র এসে স্বয়ং ত দেখলো। এরপর পাত্রের বাবাকে গিয়ে বলবো সব কথা। উনি রাজী হলেই সব ঠিক হতে আর কতক্ষণ।

জয়া শুভঙ্করের দিকে দৃষ্টি ফেরালো। দেখলো, এবারও শুভঙ্কর তার দিকে তেমনিভাবে শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে।

এমন সময় হরি সিং-এর সঙ্গে আর একটি ছেলে এলো জলখাবার নিয়ে। ডিস্‌ভর্ত্তি মিষ্টি, সরবৎ, পান ইত্যাদি।

ছেলেটির নাম রাম সিং। ওরই ছেলে।

খাবার পর তেজেন্দ্র এসে জয়াকে বললেন, রমাকে কেমন দেখলেন?

জয়া বললে, আমার ত বেশ ভাল লেগেছে। এখন পাত্রের কি মত তা কে জানে! বলে শচীকান্তর মুখের দিকে চাইলো। শচীকান্ত মৃদু হেসে মুখ ফিরিয়ে নিলে।

তেজেন্দ্র বললেন, আপনার যখন পছন্দ হয়েছে তখন পাত্রেরও নিশ্চয় পছন্দ হবে। আপনারা দু'জন বাল্য বন্ধু কি না ......হে...হে...হে।

সেদিন জয়া ও শচীকান্ত তেজেন্দ্রকে নমস্কার জানিয়ে চলে এলো। আসার সময় শুভঙ্করকে বললে, পরে আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে বলে আশা করি।

শুভঙ্কর তুষ্টু হাসি হেসে বললে, নিশ্চয়ই দেখা হবে।

বাসস্টপেজের দিকে এগুতে এগুতে জয়া শচীকান্তকে প্রশ্ন করলো, রমাকে পছন্দ হয় ত ?

শচীকান্ত কিছু বললে না। মুখ টিপে শুধু হাসলো। জয়া বললে, বুঝেছি। মৌনং সম্মতি লক্ষণং।

পরে বললে, রমাকে বিয়ে করলে তুই সুখী হবি। রমা কবিতা ভালবাসে। তুইও সেই ধরণের লোক। দু'জনে মিলবে ভাল।

শচীকান্ত এবারও মুচকি হেসে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললো বাস-স্টপেজের দিকে।

আট

শচীকান্তর সঙ্গে রমার বিয়ে ঠিক হয়ে গেল। বিয়ের দিনও স্থির হয়েছে। আগামী সতেরই বৈশাখ। দেনাপাওনা নিয়ে বিশেষ গণ্ডগোল হলো না। নগদ, গয়না ও আসবাবপত্র নিয়ে হাজার আটেক টাকা খরচ করতে রাজী হলেন তেজেন্দ্র। একবার শচীকান্তর কোষ্ঠীর কথা জিগ্যেস করেছিলেন। বাণীপ্রসাদ সে প্রসঙ্গ চেপে গেলেন। বললেন, শচীর কুষ্ঠি নেই।

তেজেন্দ্র আর কোন কথা বললেন না কোষ্ঠী বিষয়ে। তবে এটুকু বললেন, বেশী কুষ্ঠিবিচার করে কি হবে বাণীবাবু। ওর কোন দাম নেই। আমার এক বোনের বিয়ের সময় ভগ্নীপতির কুষ্ঠি নিয়ে কত বিচার করলুম। কুষ্ঠি ভাল ছিল; অথচ বিয়ের দু'বছর পরে বোনটা বিধবা হলো। সেই থেকে ঠিক করেছি, কুষ্ঠিবিচার করা বৃথা। কপালে যার যা লেখা আছে তা ঠিকই হবে। কোন কাজেই বেশী বাচ্‌বিচার করা উচিত নয়। তাহলেই বিপদ।

এর মধ্যে একদিন শুভঙ্কর এলো। রমাকে বললে, চলো আজ লেক থেকে ঘুরে আসি।

রমা বললে, আজ আমি যেতে পারব না। শরীর খারাপ।

শুভঙ্কর মনের কোণে দারুণ আঘাত পেল। ভাবলে, একি বলছে রমা! এরকম কথা ত কোনদিন বলে নি? তাকে শরীরের দোহাই দিতে কোনদিন শোনে নি। গত বছর ভীষণ টাইফয়েড থেকে ওঠার পর ওর শরীর খুব দুর্বল হয়ে পড়েছিল। সেই দুর্বল শরীর নিয়েও সপ্তাহে তিনচার বার লেকে ঘুরে এসেছে। যাব না বলে আপত্তি করে নি। আজ এমনিধারা কথা বললে কেন?

শুভঙ্কর কিছুক্ষণ নীরব থেকে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। রমার না যাওয়ার কারণ খুঁজতে থাকে।

বুদ্ধিমতী রমা বুঝতে পারলো ' শুভঙ্করের মনের অবস্থা। রহস্যচ্ছলে বললে, আমি না গেলেও তোমার কোন ক্ষতি নেই। তুমি আজ একাই ঘুরে এসো।

রমার এ কথায় শুভঙ্কর যেন আরও মুসড়ে পড়লো। বললে, আজ তুমি এসব কি বলছো রমা? তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? জানো আমার সঙ্গে তুমি না থাকলে সেদিন আমার ভ্রমণ অসার্থক হয়।

সুধাময়ী পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে শুনছিলেন সব কথা। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে বললেন, রমার আজ শরীর খারাপ। ও কোথাও যাবে না। তাছাড়া আর তিন দিন পরে ওর বিয়ে হবে। এখন ওর পক্ষে বাইরে না বেরুনোই ভাল।

মাকে আসতে দেখে রমা বড় বিব্রত বোধ করলো। আরও মুস্কিলে পড়লো যখন শুনলো তাদের কথোপকথনের মূল কথা মায়ের কথার মধ্যে।

শুভঙ্করও লজ্জা ও অপমানে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

ও কথাটি বলার পর সুধাময়ী ক্ষণকালও দাঁড়ালেন না। নীচে নেমে এলেন অমলাংশুর ঘরে। অমলাংশু পড়ায় খুব ব্যস্ত। আর সাতদিন পরেই বি. কম্ পরীক্ষা।

শুভঙ্কর সুধাময়ীর কথাগুলি হজম করতে পারলো না। রাগে ফুলতে ফুলতে গম্ভীর স্বরে রমাকে বললে, আমি চললুম।

রমা বললে, রাগ কোরো না। আমার বিয়ের রাতে আসবে ত।

শুভঙ্কর বললে, তোমার বিয়ে ত আমার কি ?

—বা ! তুমি যে আমার বন্ধু।

—বন্ধু নয়, শত্রু।

শুভঙ্করের সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো।

রমা বললে, ওকথা বললে কেন ? তবে কি তুমি আমায় ভালবাস না ? আমার ভাল কি তুমি চাও না ?

শুভঙ্কর বললে, আমি তোমার ভাল চেয়েছিলুম। কিন্তু তুমিই ত আমার দিকে একবারও চাইলে না। আমার সঙ্গে তুমি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলে—

শুভঙ্করের কথা কেড়ে নিয়ে রমা বললে, তুমি যে কি বলতে চাইছ তা আমি জানি। কিন্তু আমি কি করবো বলো। আমি নিরুপায়। আমি তোমাকে চাইলে কি হয় আমার বাপ-মা রাজী নন !

শুভঙ্কর বললে, সত্যিকারের ভালবাসা থাকলে মানুষ ওসব বাজে যুক্তি দেখায় না। তুমি আমায় ছোট মনে করো। তাই এমন অবহেলা !

রমা ছুটে গিয়ে শুভঙ্করের মুখ চেপে ধরলো। বললে, ওকথা বলো না। রাগ করো না—ছি !

শুভঙ্কর বললে, রাগ নয়—ক্ষোভ। আমি গরীব। আমি অশিক্ষিত। আমার হাতে তুমি পড়লে তোমার কষ্ট হবে। তুমি ও তোমার বাপ-মা একথা জানেন বলেই আমার হাতে তোমাকে দিলেন না।

একটু থেমে শুভঙ্কর বললে, আগে একথা জানাও নি কেন ?

রমা নিরুত্তর। দু'চোখ ভরে জল এলো।

শুভঙ্কর আর কোন কথা বললো না। একটা কুটিল দৃষ্টি দিয়ে রমার সর্বাঙ্গ বুলিয়ে বেরিয়ে এলো বাড়ী থেকে। নীচে সুধাময়ীর সঙ্গে দেখা হলো। সেখানেও নীরব।

শুভঙ্করকে অমনভাবে চলে যেতে দেখে রমা মনে আঘাত পেল।

অতি দুঃখে মাথায় হাত দিয়ে সোফায় বসে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হাজারো চিন্তার ভিড় জমলো। গত পাঁচ বছর ধরে শুভঙ্করের সঙ্গে তার দাদার পরিচয়। শুভঙ্কর প্রকৃতপক্ষে অমলাংশুরই বন্ধু। সহপাঠি বন্ধু। ও বাড়ীতে আসাযাওয়া করতে করতে রমার সঙ্গে পরিচয় হয়। রমার কাব্যপ্রীতি দেখে মুগ্ধ হয় শুভঙ্কর। শুভঙ্কর নিজে কবিতা লেখে ও পড়ে। অন্য কবির কবিতাও পড়ে। রমা তাই মনোযোগ দিয়ে শোনে। মুগ্ধ হয়। চঞ্চলা হরিণীর মত ভ্রমরকালো স্বচ্ছ চোখের দৃষ্টি কবিতার ছন্দের সঙ্গে নেচে ওঠে। শুভঙ্করের আঁকা ছবির প্রতিও রমার আকর্ষণ ছিলো। নিজের একটা ছবিও আঁকিয়েছিল।

ক্রমে শুভঙ্কর রমার প্রেমে পড়ে। পূর্ণিমাসন্ধ্যায় কতবার লেকের ধারে বসে দু'জনে কত মনের কথা নিবেদন করেছে। শুভঙ্করের বাবা মাতাল। বাড়ীতে নানারকম অশান্তি। তাই তার পড়াশুনো বেশীদূর হয় নি। ম্যাট্রিক ফেল। কিন্তু কাব্যচর্চা ও শিল্প-চর্চাতে তার দক্ষতা অসীম। সেই গুণের দাবী নিয়ে সে রমার কাছে প্রেমভিক্ষা করেছিল। রমাও তাতে সায় যে দেয় নি এমন নয়।

মনে পড়ে একদিন পূর্ণিমারাতে রমাদের তিনতলার ঘরে বসে রমা আর শুভঙ্কর। আর তৃতীয় কোন প্রাণী ছিল না। ঘর অন্ধকার। আলো জ্বালা নেই পূর্ণ চাঁদের অমলধবল জ্যোৎস্না-লোকে ঘরের চাপ্ চাপ্ অন্ধকার বেশ ফিকে হয়ে গেছলো। আলো জ্বালার প্রয়োজন হয় নি। পুব্ দিকের খোলা জানালা দিয়ে শশীরশ্মি এসে রমার খোঁপায় দুধের আলপনা এঁকে দিলো।

সেদিন সুধাময়ী ও তেজেন্দ্র বন্ধুর ছেলের অন্নপ্রাসন উপলক্ষে নেমন্তন্ন খেতে গেছলেন। অমলাংশু গেছলো সিনেমায়। রমা একা বাড়ীতে ছিলো। আর ছিলো বৃদ্ধ হিন্দুস্থানী দারোয়ান হরি সিং। রাম সিং তখন দেশে।

সেদিন রমা দোতলার ঘরে একা বসে বসে রোজনামচা লিখছিল। এমন সময় শুভঙ্কর এলো। তখন সন্ধ্যে সাতটা।

শুভঙ্কর বললে, ওটা কি ?

রমা বললে, রোজনাম্চা।

শুভঙ্কর বললে, এর মধ্যে লিখছো! এখনো যে দৈনিক জীবনের কিছুটা বাকী আছে।

রমা ঠোঁটের নীচে কলমটা চেপে ধরে বললে, ও তাইতো! ঠিক বলেছ তুমি।

ডাইরীর পাতার মধ্যে কলমটা রেখে লেখা বন্ধ করে দিলো।

পরে শুভঙ্কর রমার কাছে বাড়ীর খবর শুনলো। বাড়ীতে উপস্থিত কেউ নেই। সে একা। তার হৃদ্‌পিণ্ডটা অজানা আনন্দে অকস্মাৎ নেচে উঠলো। ভাবলো, এই ত চরম সুযোগ রমাকে কাছে কাছে পাবার। এখনি ত হৃদয়ের ভাব নিবেদন করার চরম লগ্ন।

শতগুণ উৎসাহ নিয়ে রমা যে শোফায় বসেছিল তার হাতলে এসে বসলো। রমার ঠিক কাঁধ ঘেঁসে। রমা প্রথমে আপত্তি জানালো। বললে, ওকি করছো! ওদিকে একটু সরে বসো। এখুনি যদি হরি সিং এসে পড়ে।

শুভঙ্কর প্রথমে রমার কথা শুনলো না। পরে হাতল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললে, তাহলে ওপরে চলো। আজ তোমার সঙ্গে অনেক কথা আছে।

রমা বললে, না। আজ নয়। এখানে নয়। অন্য সময় অন্যখানে বোলো।

শুভঙ্কর তবু জেদ ধরলো। শেষে রমা রাজী হলো। হরি সিংকে বললে, আমি ছাদে আছি। কেউ এলে খবর দিও।

দোতলার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে রমা ও শুভঙ্কর ওপরে চলে এলো।

ওপরের ঘরে আলো জ্বালতে গেলো রমা।

শুভঙ্কর বাধা দিলে। বললে, বাইরের এত আলো থাকতে ভেতরের এই কৃত্রিম আলো কি হবে।

রমা বললে, অন্ধকারে থাকলে লোকে বলবে কি ?

শুভঙ্কর বললে, এখানে লোক কোথায় ? তুমি আর আমি ত।

রমা বললে, হরি সিং যদি আসে।

শুভঙ্কর বললে, ও বুড়ো মানুষ। তিন তলায় ওঠবার শক্তি নেই।

রমা এবার চুপ করে থাকে। কথা বাড়ালেই বেড়ে যায়। নীরব থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলো।

শুভঙ্কর আর রমা ঘরের মেজেয় বসলো। দু'জনের মধ্যে ব্যবধান মাত্র এক হাতের। শুভঙ্কর বললে, আজকের দিনটা কত সুন্দর বলো ত !

রমা বললে, সত্যিই সুন্দর।

শুভঙ্কর বললে, এমন দিনে কি মনে হচ্ছে জানো ?

রমা বললে, কি ?

শুভঙ্কর তখন কবিগুরুর কবিতা আবৃত্তি করলো,—

"এমন দিনে তারে বলা যায়,
এমন ঘনঘোর বরিষায়।
এমন মেঘস্বরে বাদল ঝরঝরে
তপনহীন ঘন তমসায়।
সে কথা শুনিবে না কেহ আর,
নিভৃত নির্জন চারি ধার।
দু'জনে মুখোমুখি গভীর দুখে দুখী
আকাশে জল ঝরে অনিবার।
জগতে কেহ যেন নাহি আর।......"

শুভঙ্কর থেমে জিগ্যেস করলো, কেমন লাগছে ?

রমা হেসে বললে, এখন জল কৈ ? দেখছি চাঁদের আলো।

শুভঙ্কর একগাল হেসে বললে, কেন জল নেই। আমাদের হৃদয়ের প্রেমযমুনার জল......

রমা চুপ করে গেল। উত্তর দিলে না।

শুভঙ্কর বললে, চুপ করলে কেন? তোমার ভাল লাগছে কবিতাটা?

রমা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

চাঁদের ভাঙা আলোর বন্যা ঘরের মধ্যে এসে পড়েছে। তার দ্যুতিতে রমার কানের মনিপুরী মাকড়ীদুটো চক্‌চক্ করে উঠলো।

শুভঙ্কর এবার রমার কোলঘেঁষে বসলো। রমার হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে ধরে বললে, আমাকে তোমার ভাল লাগে না?

রমা বললে, কেন ভাল লাগবে না! ভাল লাগে বলেই ত আজ এখানে এলুম।

শুভঙ্কর স্বরভাঙা গলায় আনন্দে গদগদ চিত্তে বললে, তবে কথা দাও, কবে তুমি আমার হবে?

—সময়ে বলবো।

—কখন সময় হবে? বেশী দেরী হলে আমাদের প্রণয় যে মিথ্যে হয়ে যাবে।

—সত্যিও ত হতে পারে। বলে রমা খুব একচোট হাসলো।

তারপর কি একটা কাজে হরি সিং-এর ডাকে নীচে নেমে এলো রমা। শুভঙ্করের সঙ্গে আর ওবিষয়ে সেদিন কোন কথা হয় নি।

সেইদিন থেকে আশা নিয়ে বসে আছে শুভঙ্কর রমাকে জীবনে আপন করে পাবার জন্যে।

শুভঙ্কর রমাকে কত প্রেমপত্র দিয়েছে। রমাও শুভঙ্করকে একাধিক প্রেমপত্র লিখেছে। সে সব শুভঙ্করের কাছে জমা আছে।

আশা নিয়েই মানুষ বেঁচে থাকে। কিন্তু আশা যে এমন কুহকিনী হবে তা কে জানতো! সেদিন শুভঙ্করই কি জেনেছিল রমার প্রণয় ভাবীকালে এমনিভাবে ধুলিসাৎ হয়ে যাবে?

নয়

অবশেষে সতেরোই বৈশাখ এলো। রমার জীবনের নতুন ভাগ্যের দিন। আকাশে সারাদিন টুকরো মেঘের যাত্রার স্থগিত নেই। দিনের শেষে খণ্ড মেঘ পুঞ্জে পুঞ্জে স্তরে স্তরে মালার আকারে সারিবদ্ধ হয়ে দুলতে লাগলো। সকলে ভাবলে, এ বুঝি কালবৈশাখীর মেঘ। এখনি ঝড়বৃষ্টি হবে। তুমুল প্রলয় কাণ্ড ঘটবে।

কিন্তু কিছুক্ষণ পরে দেখতে দেখতে সে মালা টুকরো টুকরো হয়ে গেলো। জোড়া মেঘ পুনরায় খণ্ড খণ্ড হয়ে সারা আকাশ জুড়ে বিক্ষিপ্তভাবে ঘুরতে লাগলো। আর একটু পরে দেখা গেল আকাশ মেঘমুক্ত। একটা সামান্য দমকা হাওয়া আকাশের বুক থেকে মেঘের খণ্ডগুলি ঝাঁটিয়ে বার করে দিলো। বিপদের লগ্ন কেটে গেল। সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলো।

রমার মনে শান্তি নেই। সেদিন শুভঙ্করের ওরকম উগ্রমূর্তি দেখার পর তার মনে একরকম ভয়ের মসীরেখা আনাগোনা করতে লাগলো। সে রেখা বিষ-মাখানো শরের মত তার অন্তরকে বিদ্ধ করলো ক্ষণে ক্ষণে। গুমরে উঠলো সারা অন্তর অসহ্য অব্যক্ত যন্ত্রণায়। ভাবলো, কখন হয়ত শুভঙ্কর এসে এক অশোভনীয় কাণ্ড করে বসবে। বিশেষ করে আরও আশঙ্কা হলো, এই কারণে যে, তার কাছে রমার কতকগুলি গুপ্ত প্রণয়ের চিঠি ও কবিতা আছে। সেগুলি শুভঙ্কর নষ্ট করে নি। রমা তাকে অনেকবার অনুরোধ করেছিল ওগুলিকে পুড়িয়ে ফেলার জন্যে। শুভঙ্কর উত্তরে খালি হেসেছিল। কাজে কিছু করে নি।

বিয়ে বাড়ীতে অনেক লোকজন এসেছে। অনেকেই রমার মনের ভাব বুঝতে পারলে। আজকের এই আনন্দের দিনে রমা যে সুখী নয় তার আভাস পেল অনেকে। তবু মুখ ফুটে কিছু প্রশ্ন করতেও পারলো না কেউ। ভাবলো, রমা শিক্ষিত। সে দুঃখের

দিনেও নিজেকে সংযমী রাখতে পারবে। তাছাড়া ওর ভাবনা হয়ত অনাগত দিনের নতুন জীবন সম্বন্ধে। বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ী যাবে। সেখানে কি ধরণের ব্যবহার পাবে। ভাল কি মন্দ। এই সব চিন্তা হয়ত তার মনকে খোঁচা দিচ্ছে। তাই সে অত বিষণ্ণ। বিয়ের আগে সাধারণত মেয়েদের মনে এরকম ভাব আসা স্বাভাবিক।

বিয়ের দিন সকালে শুভঙ্কর এলো না। বিকেলের দিকে তেজেন্দ্র অমলাংশুকে পাঠালেন শুভঙ্করের বাসায়।

শুভঙ্কর বাড়ীতে ছিল না। কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়েছিল। ক্ষণিক অপেক্ষা করলো। পরে শুভঙ্কর এলে বললে, তুই আমাদের বাড়ীতে আর যাস না কেন? বিশেষকরে আজকের দিনে তোর একান্তভাবে যাওয়া উচিত ছিল।

আসল ব্যাপারটা চেপে গেল শুভঙ্কর। নির্বিকারভাবে বললে, আমার সময় নেই ভাই। হাতে অনেক কাজ।

অমলাংশু বললে, থাক্ তোর যত কাজ। আজ তোকে আমাদের ওখানে যেতেই হবে। বাবা বিশেষ করে বলে দিয়েছেন।

শুভঙ্কর অনুনয় বিনয় করে বললে, আমাকে ক্ষমা কর ভাই। আজ আমি যেতে পারবো না।

—বলিস কি? ওরকম সব্বনেশে কথা মুখে আনিস নি। তোকে আজ যেতেই হবে। তুই না গেলে আমিও আজ বাড়ী ফিরবো না।

এবার যেন শুভঙ্কর একটু নরম হলো। বললে, আচ্ছা যাবো। অমলাংশু বললে, আর দেরী করিস না। তাড়াতাড়ি জামা পরে নে। হাতে সময় বেশী নেই। বর এলো বলে।

শুভঙ্কর জামাকাপড় পরে নিলো। অমলাংশু বড় রাস্তার মোড়ে এসে একটা বেবী ট্যাক্সি ডাকলো। শুভঙ্কর ও অমলাংশু দু'জনে উঠে পড়লো ট্যাক্সিতে। ড্রাইভারকে বললে, সাউথ্ গড়িয়া রোড চলো।

ট্যাক্সি তীরবেগে ছুটলো বৌবাজার থেকে গড়িয়ার দিকে।

নির্দিষ্ট সময়ের আগেই ট্যাক্সি এসে পৌঁছলো পদ্মপলাশে। ট্যাক্সিকে দেখে বাড়ীর মেয়েছেলেরা মনে করলো বর এসেছে। একবার সমবেতকণ্ঠে কতকগুলি শাঁখও বেজে উঠলো।

কনেকর্তা তেজেন্দ্র ছুটে এলেন ট্যাক্সির কাছে। দেখলেন, বর নয় শুভঙ্কর এসেছে। পেছনে দাঁড়িয়ে অমলাংশু।

শুভঙ্করের পিঠে হাত দিয়ে বললেন, এত দেরীতে আসতে হয় বাবা। সকালে আসো নি কেন ?

শুভঙ্কর কিছু বললে না।

তেজেন্দ্র অমলাংশুকে বললেন, শুভঙ্কর শক্ত ছেলে। ওকে ভেনের ওখানে বসতে বলো।

শুভঙ্কর তেজেন্দ্রর কথামত ছাদের ওপর ভেনের কাছে গিয়ে বসলো। পরে কি মনে করে একবার রমার কাছে ছুটে এলো। রমার তখন সাজ হয়ে গেছে। অপূর্ব সাজে সেজেছে সে। ঘন কালোচুলে অপূর্ব কবরী। তার ওপর জড়িয়েছে বেলফুলের কুঁড়ি দিয়ে গাঁথা মালা। গন্ধে সারা ঘর আমোদিত। কপালে ও গালে চন্দনফোঁটার নক্সা। গলায় নতুন ডিজাইনের হার। হাতে নতুন ফ্যাসানের চুড়ি। গায়ে লাল সিল্কের ব্লাউজ। পরণে লাল বেনারসী। তার কোলে রূপালী ফুলতোলা। অপরূপ বধূসাজ। সুন্দরী রমাকে আরও সুন্দরী দেখাচ্ছে।

রমা একটা শোফায় একাকী বসেছিল। শুভঙ্কর গিয়ে দেখা করলো।

রমা বললে, অভিমান ভেঙেছে ?

শুভঙ্কর বললে, হ্যাঁ।

রাগ করেছিলে কেন ?

—রাগ করি নি। হাতে একটা কাজ ছিলো ; তাই সকালে আসতে পারি নি।

—থাক হয়েছে, আমি সব জানি। আর মিথ্যে কথা বলতে হবে না···

হঠাৎ হুলুধ্বনি হলো। একাধিক শাঁখ বেজে উঠলো। বাড়ীর লোকজন ছুটোছুটি লাগিয়ে দিলো।

শুভঙ্কর ঘরের জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে, বর এসেছে।

রমাও উঠে গেলো। জানলার কাছে দাঁড়ালো। দৃষ্টি তার শুভঙ্করের ওপর। কি যেন বলতে চাইছে। কিন্তু বলতে পারলো না। চোখদুটি জলে ভরে এলো। ভাঙা-গলা থেকে কেবল মাত্র একটি অস্ফুটধ্বনি বেরিয়ে এলো, এখন তবে চলি।

শুভঙ্কর উত্তেজিতভাবে বললে, চলি নয়, বলো আসি। রমা তাই বললে। বলার পর শুভঙ্করের হাতে মাথা রেখে কান্নায় ভেঙে পড়লো। শুভঙ্করের চোখেও জল।

পরে শুভঙ্কর নিজেকে সংযত করে বললে, এত অধীর হয়ো না রমা। আজ শুভদিন। কাঁদতে নেই। ওঠো—মাথা তোল।

রমা চোখ মুছতে মুছতে মাথা তুললো। করুণ নয়নে ম্লান অরুনাভা নিয়ে একবার শুভঙ্করের দিকে তাকিয়ে বললে, তোমাকে একবার প্রণাম করি।

শুভঙ্কর সর্বশরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে পেছনে দু'পা সরে গেল। বললে, সেকি—আমাকে প্রণাম করবে কেন?

রমা স্খলিত স্বরে বললে, প্রণাম করারও কি অধিকার নেই?

—বেশ, তোমার যা মন চায় তাই করো।

শুভঙ্কর পা দুটো এককরে রমার সামনে এসে দাঁড়ালো। রমা গলায় আঁচল জড়িয়ে নতজানু হয়ে শুভঙ্করের চরণযুগলে শির নোয়ালে।

তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, বলো, আমাকে ভুলে যাবে না?

শুভঙ্কর প্রথমে উত্তর দিতে পারলো না। তার গলা যেন কে শক্ত করে ধরেছে। অন্তরের স্বর মুখে আসতে পাচ্ছে না। গলায় আটকাচ্ছে।

সেই মুহূর্তে রমার দু'জন সহপাঠিনী বন্ধু আনন্দে লাফাতে লাফাতে এলো রমার কাছে। বললে, তোর বর এসেছে। ready থাক্। এখুনি ছাতনাতলায় যেতে হবে।

শুভঙ্কর ঘর ছেড়ে চলে এলো বাইরে। রমার কথার জবাব দেওয়া হলো না।

দশ

দিন যায় নদীর স্রোতের মত। দেখতে দেখতে তিনমাস কেটে গেল। শচীকান্ত রমাকে পেয়ে সুখী হয়েছে। তাদের সংসারে কষ্ট নেই। মনের মিলই বড় মিল। সেই মিলন সার্থক হয়েছে। মা বকুলরাণীও সুখী।

কেবল একজন সুখী নয়। সে হচ্ছে শচীকান্তর বড়ভাজ মঞ্জুষা। রমাকে সে সুনজরে দেখলো না।

মঞ্জুষা অশিক্ষিতা। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে। রমা শিক্ষিতা। শহরের মেয়ে। দু'জনের মনের রুচি ও প্রকৃতি ভিন্ন হওয়া কিছু বিচিত্র নয়। তাই সামান্য ছুতোনতা পেলে মঞ্জুষা রমাকে দু'চার কথা শুনিয়ে দিতে ছাড়ে না।

একদিন সুধাকান্ত খেতে বসেছে। রমা খাবারের জল দিতে ভুলে গেছে। কি একটা কাজে শচীকান্তর কাছে এলো।

মঞ্জুষা রান্নাঘর থেকে থালায় করে ভাত বেড়ে আনতে সুধাকান্ত বললে, জল দিলে না এক গেলাস ?

মঞ্জুষা ড্যাব্‌ড্যাবে চোখদুটো বড় বড় করে কপালে তুলে বললে, রমা তোমাকে জল দেয় নি ? অত বড় মেয়ের আক্কেলটা কিরকম দেখলে !

তারপর ভাতের থালাটা স্বামীর কাছে রেখে রান্নাঘর থেকে হাত ধুয়ে এলো। পেছন ফিরে মুখ বেঁকিয়ে আড়চোখে শচীকান্তর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে ভাঁড়ার ঘরে রাখা কলসী থেকে জল গড়াতে লাগলো।

জল এনে স্বামীর পাতের কাছে রাখতে রাখতে বললে, শিক্ষিত মেয়েকে ঘরে এনেছ কিনা, তাই এইরকম।

সুধাকান্ত কিছু বললো না। মুখভার করে একবার স্ত্রীর দিকে তাকালো।

পরে সুধাকান্ত ও শচীকান্ত অফিসে চলে গেলে মঞ্জুষা রমাকে খুব একচোট কড়া কথা শুনিয়ে দিলে। বললে, শুনেছি তুমি শিক্ষিতা মেয়ে—বয়েসও বেশ। সাধারণ জ্ঞান তোমার নেই!

রমা অবাক হয়ে তাকালো মঞ্জুষার দিকে।

প্রশ্ন করলে, কি বলছেন দিদি?

—বলছি আমার মুণ্ডু আর মাথা। বলি, সকালে ভাশুরকে জল দিতে ভুলে গেলে কেন? শুধু আসন পাতলেই জায়গা করা হয়ে যায়?

রমা মনে মনে ভাবলে, ও, এর জন্যে এত কাণ্ড। তারপর বললে, উনি একটা কাজে আমাকে ডাকলেন বলে তাড়াতাড়ি ঘরে চলে গেলুম। জল গড়াতে ভুলে গেছি।

—ওরকম ভুল ত হবেই আমি জানতুম।

রাগে ক্রুদ্ধ ফণিনীর মত ফুলতে ফুলতে মঞ্জুষা একমাত্র ছেলে রতিকান্তকে নিয়ে রান্নাঘরে এলো।

রমা কাউকে কিছু না বলে ওপরে শোবার ঘরে এলো। সে শিক্ষিতা। জানে মঞ্জুষার কথার ওপর কথা বলা মানে একটা বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি করা। তাছাড়া মঞ্জুষা তার বড় ভাজ। মায়ের সমান মান্যা। তার মুখের ওপর কিছু বলা শোভা পায় না।

নিত্যপূজার পর বকুলরাণী রোজ একবার করে গীতা ও চণ্ডী পড়েন। আজও তাই পড়ছিলেন। মঞ্জুষার কর্কশ ভাষণ তাঁর কানে গেল। রমাকে দেখে বললেন, কি হলো কী? বড় বৌমা অমনধারা চেঁচাচ্ছিল কেন? সে এক গেলাস জল গড়াতে পারলো না। যে রাঁধে সে কি চুল বাঁধে না!

রমা কোন কথা বললে না। চুপকরে রইলো। মঞ্জুষাও নীচে থেকে শাশুড়ীর কথা শুনতে পেল না।

আর একদিন আর একটা ব্যাপার ঘটে গেছে।

শুভঙ্কর ও জয়া এসেছে শচীকান্তর কাছে। ওপরে শচীকান্তর শোবার ঘরে ওরা এসে বসেছে। রেডিও বাজছে। রমা ও শচীকান্ত আছে ঘরে।

চারজনে মিলে খুব গল্পগুজব হাসিঠাট্টা চলছে।

মঞ্জুষার তা ভাল লাগছে না।

নীচে থেকে গজড়াচ্ছে।

বকুলরাণী রান্নাঘরে মঞ্জুষার কাছেই বসেছিলেন। কুটনো কুটছিলেন। মঞ্জুষা তেড়েমেড়ে হাত-পা নেড়ে বললে, দেখছেন ত মা! শুনছেন ত ওপরের হৈ-চৈ। আপনার ছোট বউকে একটু সাবধান করে দেবেন।

বকুলরাণী বললেন, এই ত হৈ চৈ করার বয়েস। পরে কি আর এরকম করতে পারবে।

—তাহোক, আমার মতে এসব কাজ করা ভাল নয়। কোথাকার কে ঠিক নেই। তার সঙ্গে অত হি হি হা হা করার কি দরকার? নতুন বৌ যখন তখন শ্বশুর বাড়ীতে এসে একটু সমীহ করে চলা উচিত।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মঞ্জুষা হাঁফাতে লাগলো।

বকুলরাণী বললেন, ঘরে বাইরের লোক কেউ নেই। জয়া আর শুভঙ্কর রয়েছে। জয়াকে ত তুমি চেন। আর শুভঙ্কর হচ্ছে রমা ও অমলাংশুর বন্ধু। ছেলেটি খুব ভাল। যেমন ব্যবহার তেমনি মিষ্টি কথাবার্তা।

মঞ্জুষা ভ্রূ কুঁচকে আড়চোখে বকুলরাণীর মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে বললে, তাহোক, আজকালকার ছেলেদের মন বোঝা দায়। মিষ্টি কথা অনেকেই বলতে পারে। পরে তাই থেকে অন্য কাণ্ড ঘটে যায়।

বকুলরাণী এবার সামান্য উত্তেজিত হয়ে বললেন, তুমি কি তবে শুভঙ্করকে সন্দেহ করো?

—ঠিক সন্দেহ নয়। তবে নিজে সাবধান থাকা ভাল। রমার এখন কাঁচা বয়েস। পা পিছ্লোবার সম্ভাবনা বেশী।

—পা পিছ্‌লোবার হলে আগে থেকেই পিছ্‌লোত। এখন বিয়ে হয়েছে। ও ভয় আর নেই।

—বিয়ে হলেই কি মানুষ ভাল হয়ে যায়? আপনি শুভঙ্করকে এতটা বিশ্বাস করেন?

—তোমার সঙ্গে আমি তর্কে পেরে উঠবো না বৌমা। রমাকে তুমি এ সম্বন্ধে কিছু বলো না। ও মনে দুঃখ্যু পাবে। যা বলবার আমিই পরে বুঝিয়ে বলবো। তাছাড়া কোন দিন খারাপ কিছু চোখে পড়লে কাউকে ছাড়বো মনে করেছ!

মঞ্জুষা যেন এবার একটু শান্ত হলো। আটা মাখার পর লেচি তৈরী করলো। তারপর কুটনোর থালা থেকে কাটা আনাজ তুলে নিয়ে কড়ায় ছেড়ে দিলো। গরম তেলের সঙ্গে আনাজ মিশে কড়ার মধ্যে থেকে একটা বিশ্রী শব্দ বেরুতে লাগলো। কারও কথা কেউ আর শুনতে পেল না। সুতরাং দু'জনেই নীরব।

এগার

টক্ টক্ টক্

দরজার ওপর করাঘাত করলো শচীকান্ত। আজ ওর শরীরটা ভাল নেই। তাই দুপুর বেলায় অফিস থেকে চলে এসেছে বাসায়।

ওর ঘরের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ করা।

দরজা খোলা না পেয়ে আবার আওয়াজ করলো শচীকান্ত। তবু কোন সাড়াশব্দ নেই।

শচীকান্ত ভাবলো, রমা হয়তো ঘুমুচ্ছে। এই অসময়ে ও কি এখনো জেগে আছে।

এমনি ভাবছে এমন সময় দরজার ভেতর থেকে ফিস্ ফিস্ শব্দে কার কণ্ঠস্বর কানে এলো।

শচীকান্ত দরজার গায়ে কান পেতে শুনলো ঐ কণ্ঠস্বর। পুরুষ মানুষের কণ্ঠস্বর বলে মনে হলো।

আরও চঞ্চল হলো শচীকান্ত।

এবার দরজার ওপর সজোরে করাঘাত করলো। কেবল করাঘাত নয়, গলাছেড়ে ডাকলো, রমা, ও রমা। এবারও কোন সাড়াশব্দ এলো না।

এবার শচীকান্ত রমার গলা শুনতে পেলো। রমা যেন কাকে বলছে, তুমি তাড়াতাড়ি জামাটা পরে এখান থেকে চলে যাও। দেরী কোরো না। দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই বেরিয়ে যাবে ঘর থেকে।

এবার পুরুষের গলা শুনতে পেলো শচীকান্ত। সে রমাকে বলছে, যদি কেউ সন্দেহ করে ওরকমভাবে বেরিয়ে গেলে?

রমা বললে, সে ভয় কোরো না। তার জবাব আমি দেবো।

পুরুষটি আর কিছু বললো না।

শচীকান্ত অনেক চেষ্টা করলো তার গলার স্বর চেনবার জন্যে। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারলো না।

রমা আস্তে আস্তে দরজা খুলে দিলো। একটা পাল্লা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই একটি লোক সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বেরিয়েই একেবারে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো নীচে।

শচীকান্ত অবাক হয়ে গেল। এ রহস্যের মর্মভেদ করতে পারলো না প্রথমটা।

বিস্ময় ও চঞ্চলতা তার কণ্ঠস্বরকে চেপে ধরলো। জড়িতকণ্ঠে বললে, রমা, ও লোকটা কে?

বলেই বারান্দার ওপর ঝুঁকে পড়লো।

নীচে কাউকে দেখতে পেলো না।

রমা বললে, ওকে তুমি চিনতে পারলে না? ও যে আমাদের শুভঙ্কর।

শচীকান্তর চোখমুখ লাল হয়ে উঠলো। জোরে জোরে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে লাগলো।

উত্তেজিত ভাবে বললে, ও এমন সময় এখানে কেন?

রমা বললে, আজ ওর কোন কাজ ছিল না তাই আমার কাছে এসেছিল। ও তাজমহল সম্বন্ধে একটা সুন্দর কবিতা লিখেছিল। তাই শোনাতে এসেছিল।

হুঁ। বলে শচীকান্ত খানিকক্ষণ চিন্তা করতে লাগলো। তারপর রমার দিকে তির্য্যক চাউনি নিয়ে বললে, রোজ বুঝি এমনি সময় ও আসে তোমাকে কবিতা শোনাতে? ওর কি আর অন্য সময় আসতে নেই।

রমা ঠোঁটের কোণে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটিয়ে বললে, তা কেন আসবে না। আজ কি মনে হয়েছিল তাই এলো। রোজ এমনি ভাবে আসে না।

তারপর রমা বললে, আজ তুমি এমন অসময় এখানে এলে?

বিরক্তিভরে শচীকান্ত বললে, তোমাদের লীলা দেখার জন্যে।

রমা উত্তেজিত হলো। বললে, এসব কি বলছো যা তা।

—আমি ঠিকই বলছি। একবার ভেবে দেখো।

—আমি ভেবেছি। ওর কোন দোষ নেই। তুমি মিথ্যে সন্দেহ করছো।

—সন্দেহ করার যথেষ্ট কারণ আছে।

কি কারণ বলো, জবাব দিলো রমা।

শচীকান্তর তেমনি উত্তেজিত ভাব। আরও বেশী উত্তেজিত হয়ে বললো, ও এসেছে তাতে ক্ষতি হয় নি। তুমি ঘরের দরজা বন্ধ করলে কেন?

রমা বললে, দুপুরবেলায় সকলে যে যার ঘরে শুয়ে ঘুমুচ্ছে। আমার ঘরের দরজা খোলা থাকবে এটা যেন কেমন লাগলো আমার কাছে। তাছাড়া তোমাদের দুষ্টু বেড়ালটা বড় উৎপাত করছিল। তাই দরজা বন্ধ করে দিয়েছি।

শচীকান্ত বললে, তোমার এসব বাজে যুক্তি আমি বিশ্বাস করি না রমা।

তবে কোন যুক্তি তুমি বিশ্বাস করো?

শচীকান্ত চুপ করে রইলো। রাগে তার সর্বশরীর কাঁপতে লাগলো।

রমা ভাবলো, এখুনি বুঝি একটা অনর্থ ঘটবে! আগ্নেয়গিরির অন্তরে লাভা টক্‌বক্‌ করে ফুটছে। এখনি বুঝি সে বেরিয়ে আসবে সবেগে। হবে প্রলয়ঙ্কর অবস্থার উদ্ভব।

রমা আর চুপ করে থাকতে পারলো না। শচীকান্তর পায়ের ওপর হাত রেখে বললে, তুমি রাগ কোরো না। লক্ষ্মীটি, তুমি রাগ কোরো না। আমার কথা শোনো। তুমি আমাকে বিশ্বাস করো। সত্যি আমি কোন অপরাধ করি নি।

শচীকান্তর মন এবার শান্ত হলো। ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে এলো।

খাটের উপর ধপ্‌ করে বসে পড়লো। রমাও তার পাশে এসে বসলো।

শচীকান্ত ধীরে ধীরে বললে, এবার আমায় কথা দাও, আমার অনুমতি ছাড়া তুমি শুভঙ্করের সঙ্গে একা কোথাও যাবে না বা কথা বলবে না।

অবস্থার গুরুত্ব বুঝে রমা প্রতিশ্রুতি দিলে। বললে, তাই করবো। তোমার কথা অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো।

রমা সেদিন শচীকান্তর সঙ্গে ও বিষয়ে আর কোন তর্কবিতর্ক করে নি। সে জানে সে নিষ্পাপ। ব্যাপারটি আরও ঘাটালে সকলে অন্য রকম ভাববে। তাই সেদিনকার সে মুহূর্তের জন্যে নীরবে শচীকান্তর আদেশ মাথায় তুলে নিলো।

এরপর কয়েক হপ্তা শুভঙ্কর রমাদের বাড়ীতে আসে নি। পরে শচীকান্ত শুভঙ্করের বাড়ীতে গিয়ে তাকে ডেকে আনলো। আবার সেই আগের মত মেলামেশা চলতে লাগলো। তবে রমা যতটা পারতো শচীকান্তর আদেশ পালন করার চেষ্টা করতো।

বার

বৌবাজার অঞ্চলে বাঞ্ছারাম অক্রূর দত্ত লেনের এক পোড়ো ভাঙা বাড়ীতে থাকে শুভঙ্কর। দোতলা ছোট্ট বাড়ী। বয়েস হবে পঞ্চাশ বছর। বাইরে বালির কাজ অনেক জায়গায় উঠে গেছে। নীচে ছু'খানা ছোট ঘর, ওপরে একখানা বড় ঘর। সেই বড় ঘরে থাকে শুভঙ্কর। নীচের ছু'টি ঘরে একটিতে থাকে দীপঙ্কর আর অন্যটিতে থাকে ছোট ভাই তীর্থঙ্কর।

এটা ভাড়াটে বাড়ী।

শুভঙ্করের মা নেই। বাবা আছেন। নাম দীপঙ্কর ঘোষ। এখন পেন্সন ভোগী। আগে বাংলা গভর্ণমেণ্টের অধীনে ভাল চাকরী করতেন। অনেক টাকা কামিয়েছেন। কিন্তু সুরাসক্ত হওয়ার গুণে প্রায় সব টাকা জলে ফেলেছেন।

তার মা তারাদেবী বড় বুদ্ধিমতী ও গুণবতী নারী ছিলেন। কোলিয়ারীর ম্যানেজার বাপ হরিপ্রসন্ন মারা যাবার আগে কিছু টাকা রেখে গেছলেন মেয়ে তারার নামে। সেই টাকা দীপঙ্কর বাড়ী তৈরী করার নামে নিয়ে রেস খেলে ও মদ্ খেয়ে উড়িয়ে দিলেন। বাড়ী তৈরী করা আর হলো না। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকতে হচ্ছে।

শুভঙ্কর চাকরী করে না। ছু' একটা টিউশানী করে নিজের খরচ-খরচাটা কোন রকমে চালিয়ে নেয়। শুভঙ্করের এক ভাই আছে। সে কলেজে পড়ে।

আজ সকাল থেকে শুভঙ্করের মনটা খুশীতে ভরা। রমাকে নিয়ে সিনেমায় যাবে। শচীকান্ত ওকে বলেছে অগ্রিম টিকিট কাটতে। ও যাবে, রমা যাবে আর শচীকান্ত যাবে।

আজ শচীকান্তর বেশ দেরী হবে অফিস থেকে ফিরতে। অফিসে অনেক কাজ। ছ'টার আগে ওখান থেকে বেরুতে পারবে না।

তাই শুভঙ্করকে টিকিট কেনার ভার দিয়েছে। বলেছে, শুভঙ্কর তাদের বাড়ীতে গিয়ে রমাকে সঙ্গে নিয়ে 'রাধা' সিনেমায় যাবে। সে অফিস থেকে বেরিয়ে বাড়ী না গিয়ে সোজা চলে আসবে রাধায়।

শ্যামবাজারে 'রাধা' সিনেমাহলে বেশ ভাল বই হচ্ছে। রোজ হাউস ফুল থাকে। আগে থেকে টিকিট কেটে না রাখলে ছবি দেখতে পাবে না।

সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে পাড়ার একটা ছেলেকে পড়িয়ে এলো শুভঙ্কর। তারপর সামান্য প্রসাধন সেরে একটা পায়জামা আর আর্দির পাঞ্জাবি পরে বেরুলো।

'রাধা' সিনেমার সামনে এসে দেখে কাউণ্টারে লাইন দিয়েছে। সে এসে লাইনে দাঁড়ালো।

পরে পাঁচ সিকা দামের তিনখানা টিকিট কিনে শিস্ দিতে দিতে শুভঙ্কর বাসায় ফিরলো।

ছুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর একটা ভাল ঘুম দেওয়ার আশায় বিছানার ওপর শরীর ঢেলে দিলো শুভঙ্কর।

কিন্তু যে আশায় বিছানায় শোওয়া তা সিদ্ধ হলো না। শুভঙ্করের চোখে ঘুম নেই। নানারকম চিন্তা এসে তাকে উত্তক্ত করতে লাগলো।

নির্জন ছুপুর। নীচের ঘরে দীপঙ্কর নিদ্রিত। ছোট ভাই তীর্থঙ্কর গেছে কলেজে। বাড়ীতে আর কেউ নেই।

একা একা একটা ঘরে শুয়ে নানারকম চিন্তা করছে শুভঙ্কর। ভাবছে অনেক কথা বিগত জীবনের নানান ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

অমলাংশুর সঙ্গে আলাপ। তারপর রমার সঙ্গে। ক্রমে রমার সঙ্গে হৃদ্যতা ঘনীভূত হয়ে গভীর প্রণয়ে রূপান্তরিত হলো। তারপর এক ঝড় এসে সে মিলনমালা ছিন্ন বিছিন্ন করে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিলো।

বিয়ের দিনে রমার অশ্রুভরা আয়তচোখের করুণ দৃষ্টির কথা মনে পড়লো। মনে পড়লো রমার শেষ কথার উত্তর দেওয়া এখনো

বাকী আছে। আবার ভাবে, উত্তর মুখে না দিলেও মনের দ্বারা ত দিয়েছে। রমাকে সে ভুলতে পারছে কৈ? রমার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করে আসি। বৌদি মঞ্জুষা বিরক্ত হয় শুভঙ্করকে দেখে। তবু ত সে বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ করে নি শুভঙ্কর। কমপক্ষে হপ্তায় একবার যায়। কেন যায়? কি স্বার্থ আছে তার? সেত ঐ রমার জন্যে? আবার ভাবে, রমা একদিন শ্বশুরবাড়ীতে বসে তাকে অনুরোধ করেছিল, তুমি এবার একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে করো।

সে মৃদু হেসে বলেছিল, তোমার চেয়ে সুন্দরী?

রমা মৃদুহাসি হেসে বলেছিল, হ্যাঁ।

সে বলেছিল, তা হয় না রমা। আমি বিয়ে করবো না ঠিক করেছি।

—কেন, আমার ওপর অভিমান করে তুমি বিয়ে করবে না?

সে ঘাড় নেড়েছিল শুধু। কথায় মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। ভাবটা ছিল নেতিবাচক।

ভাবনার মাঝখানে শুভঙ্করের মন বিদ্রোহ হয়ে উঠলো। ভাবলো, রমার কাছে সে কেন যাবে? কি সে পেয়েছে রমার কাছ থেকে? সে ত এতদিন একতরফা ভালবেসে এসেছে রমাকে। রমা তাকে প্রতিদানে কি দিয়েছে? কিছুই পায় নি, কেবল অলিক প্রতিশ্রুতি আর বিশ্বাসঘাতকতার চক্‌মকি।

একবার ভাবলো, যাবে না। আবার ভাবলো, না টিকিট যখন কেনা হয়েছে তখন যাওয়া উচিত। মনটা শান্ত করে শরীরে একটা মোচড় দিয়ে উঠে পড়লো।

দেওয়াল ঘড়িতে তিনটে বাজল ঢং ঢং ঢং।

তের

ঘড়িতে তিনটে বেজে গেল। গরমের দিন। বড় বেলা। এখনো সময় আছে। ছ'টার শো। আর একটু পরে উঠলেই

চলতো। এই ভেবে শুভঙ্কর আবার শুয়ে পড়লো। হাতে শরৎ চন্দ্রের শ্রীকান্ত।

ঘণ্টা খানেক কাটলো ঐ ভাবে। পরে বিছানা থেকে উঠে পড়লো।

সিল্কের পাঞ্জাবিটা আগে থেকেই বাক্স থেকে বের করে রেখে-ছিল। সেইটা গায়ে চড়ালো। শান্তিপুরের একটা কাঁচি ধুতি পরলো।

পায়ে পালিশকরা গ্রিসিয়ান পাম্‌সু। চুলটায় লাইমজুস্‌ আর ব্রাস দিয়ে পালিশ করে নিলো। ঘাড়ে মুখে পাউডার দিল। রুমালে একটা সুগন্ধি ঢেলে শিস্‌ দিতে দিতে বেরিয়ে পড়লো পথে।

পৌনে পাঁচটায় রমাদের বাসায় এলো শুভঙ্কর। দরজায় কড়া নাড়তে মঞ্জুষা দরজা খুলে দিলো।

ভ্রুযুগল কুঁচকে মুখময় একটা বিকৃত ভাব নিয়ে এমনভাবে তাকালো শুভঙ্করের দিকে যেন সে বলতে চাইছে, ও বাড়ীতে শুভঙ্করের স্থান আর হবে না। হওয়া উচিতও নয়।

শুভঙ্কর বদ্ধ নয়নে একবার মঞ্জুষার দিকে তাকিয়ে কিছু না বলে ওপরে উঠে গেল। রমার ঘরে এলো।

রমা তখন চুল বাঁধায় ব্যস্ত। শুভঙ্করকে দেখে মাথার কাপড়টা টেনে দিলো। বললে, তুমি আসবে আমি জানি। তাই ত তৈরী হয়ে নিচ্ছি।

শুভঙ্কর বললে, সে আমার ভাগ্যের জোর। মেয়েরা সাজতে বেশ সময় নেয়। আগে থেকে তারা যদি সে বিষয়ে সতর্ক হয় তাহলে পুরুষের প্রশংসা পায়।

বলে রমার দিকে সকৌতুক দৃষ্টিতে তাকালো। রমা উৎফুল্লচিত্তে বললে তুমি বড় দুষ্টু।

চুল বাঁধা হয়ে গেল। এবার সিঁদুর পরার পালা। সিঁথিতে ভাল করে সিঁদুর দিতে পারে না রমা। বড় চওড়া হয়ে যায়। দেখতে বিশ্রী লাগে। বিশেষকরে আজকে সে ভাল করে সিঁদুর

দেবে সিঁথীতে। অত্যন্ত সাবধানে সরু করে একটা ছোট রেখা এঁকে দেবে। যাতে তার মুখের সঙ্গে সঙ্গতি বজায় থাকে। লোকে দেখে হাসবে না। দূর থেকেও সহজে দেখা যাবে না।

আর সিঁদুর টিপ। তাও অতি ছোট করে পরবে। রমা শুভঙ্করকে বললে, তুমি একমিনিট চুপ করো। এখন কথা কয়ো না।

শুভঙ্কর কৌতূহলী হয়ে শুধোয়, কেন বলোত ?

—আমি সিঁদুর পরছি। কথা বললে যদি বেঁকে যায় ?

—ও সেই জন্যে !

শুভঙ্কর চুপ হয়ে গেল। রমা আয়নার কাছে মুখ নিয়ে এসে মনোযোগ দিয়ে সিঁদুর পরলো। মাথা থেকে সোনার কাঁটা তুলে রূপোর সিঁদুরের কৌটা থেকে সিঁদুর নিয়ে সিঁথিতে দিল। তারপর গুণ গুণ সুরে গান করতে করতে এদিক ওদিক তাকালো। আয়নায় দেখল মুখটা বার বার। বাঃ চমৎকার মানিয়েছে। এতদিন পরে এইবার ঠিক সিঁদুর পরা হয়েছে।

শুভঙ্করের কাছে গেল। বললে, দেখতো সিঁদুর পরা ঠিক হয়েছে কিনা ? আধুনিক স্টাইল বজায় আছে ত ?

শুভঙ্কর ঠোঁটের দু'পাশে হাসি ছড়িয়ে মিহি সুরে বললে, হ্যাঁ। আজ সত্যি তোমাকে বেশ মানিয়েছে।

রমা বললে সত্যি ?

—হ্যাঁগো হ্যাঁ। সত্যি নয়তো কি মিথ্যে বলছি। আমাকে অবিশ্বাস হয়। আয়নাকে ত অবিশ্বাস করতে পার না।

—থাক্ খুব হয়েছে। আর কোন কথা শুনতে চাই না।

রমা চলে এলো আয়নার কাছে। লতার মত পাতলা দেহটা দু'ভাঁজ করে এক পাক্ ঘুরে দাঁড়ালো আয়নার সামনে।

সিঁথিতে সিঁদুর দেওয়া ঠিক হয়েছে। এবার কপালের টিপটা ঠিক হলে বাঁচা যায়।

শুভঙ্করকে আবার সাবধান হতে বললে, একটু চুপ করো। এবার টিপ পরছি।

শুভঙ্কর আগে থেকেই নীরব ছিল। এবার রমার কথায় আঙ্গুল দিয়ে মুখে চাবি দিলে।

রমা হেসে বললে, ও কি ?

শুভঙ্কর কথা বললো না।

রমা আয়নার কাছে এসে টিপ পরতে লাগলো। বেলের কাঁটার গোড়া দিয়ে আরম্ভ করলো।

টিপ পরার পর নিজে একবার আয়নাতে ভাল করে দেখে নিয়ে শুভঙ্করের কাছে এসে বললে, এবার দেখতো, টিপটা কেমন হলো।

শুভঙ্কর বললে, ভালই হয়েছে। আমি আর কি বলবো! তোমার আদর্শ সাক্ষী ত সামনেই রয়েছে।

রমা বললে, কে ?

—কেন আয়না।

রমা ফিক্ করে হাসলো।

টিপ পরা হয়ে গেলে রমা কলঘরে চলে এলো। শুভঙ্করকে বললে, একটু অপেক্ষা করো। আমি বাথ্রুম থেকে আসছি।

শুভঙ্কর বললে, ওখানে যেন বেশী দেরী না হয়।

রমা বললে, না। দেরী হবে না। এখনো ত অনেক দেরী শো আরম্ভ হতে।

রমা ঘর থেকে বেরিয়ে এলো বারান্দায়। বারান্দা পেরুলেই কলঘর। বারান্দার উল্টোদিকে নীচে নামবার সিঁড়ি। সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে মঞ্জুষা এতক্ষণ রমা ও শুভঙ্করের কথা আড়ি পেতে শুনছিলো। রমাকে দেখে তাড়াতাড়ি নীচে নেমে গেল। রমা তা জানতে পারলো। কিছু না বলে বাথ্রুমে ঢুকে পড়লো।

মিনিট দশেক পরে রমা বাথ্রুম থেকে বেরিয়ে ঘরে এলো। শায়া আর ব্লাউজ পরা। সারা শরীরে কাপড়টা আলতোভাবে জড়ানো।

শুভঙ্করকে দেখে বললে, একটু ওঘরে যাও তো। কাপড়টা ভাল করে পরে নিই।

শুভঙ্কর পাশের ঘরে গিয়ে বসলো।

পরে সাজগোজ হয়ে গেলে রমা আর শুভঙ্কর বেরিয়ে পড়লো।

যাবার সময় মঞ্জুষা ও বকুলরাণী ওদের কিছু বললেন না।

ওনারা আগে থেকেই জানতেন ওরা আজ সিনেমায় যাবে। শচীকান্ত সকালে অফিস যাবার সময় বলে গেছে মাকে আর বৌদিকে।

ওরা চলে গেলে মঞ্জুষা বকুলরাণীকে বললে, মা ঠাকুরপোর কিরকম আক্কেল দেখুন, কোথাকার কে একটা উটকো লোকের সঙ্গে রমাকে সিনেমায় পাঠালো।

বকুলরাণী ধীরভাবে বললেন, ও ওদের সঙ্গে যাবে। আমাকে আগে থেকে জানিয়েছে। অফিসে ওর আজ অনেক কাজ। বাড়ীতে আসতে পারবে না। অফিস থেকেই সোজা সিনেমায় যাবে।

—তাহোক মা, আমার যেন এসব ভাল লাগে না

বকুলরাণী হেসে বললেন, কি আর বলি বলো। ওরা বড় হয়েছে। ভালমন্দ সব বুঝতে শিখেছে। সেইমত চললে ওদেরই ভাল হবে।

এর ওপর মঞ্জুষা আর একটি কথাও বললে না। পুত্র রতিকান্ত এসে আঁচল ধরে বায়না ধরলো, মা, দুধ খাবো।

মঞ্জুষা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। মুখে থম্‌থমে ভাব। রাগের চিহ্ন হয়তো।

চৌদ্দ

ট্যাক্সিতে চেপে রমা আর শুভঙ্কর রাধা সিনেমার সামনে এসে নামলো। তখনও শো আরম্ভ হতে বিশ মিনিট বাকী। ম্যাটিনী শো চলছিল।

ট্যাক্সি থেকে নেমেই শুভঙ্কর ট্যাক্সির মিটারের দিকে লক্ষ্য

করলো। তারপর ফুলকাটা পাতলা চামড়ার মনিব্যাগ থেকে একটা দশটাকার নোট বের করে ড্রাইভারকে দিলো।

ড্রাইভার ন্যায্য ভাড়া কেটে নিয়ে বাকী খুচরো পয়সা শুভঙ্করের হাতে তুলে দিয়ে ট্যাক্সিতে স্টার্ট দিলো।

শুভঙ্কর ও রমা অডিটোরিয়ামে এসে দাঁড়ালো। সেখানে দেওয়ালের গায়ে টাঙ্গানো চলমান ছবির বিভিন্ন বিষয় বস্তু সংক্রান্ত প্রেভাকলারের ছবি নিরীক্ষণ করতে লাগলো। যে ছবি আগামী দিনে আসবে তারও কিছু কিছু বিজ্ঞাপনী চিত্র প্রাণভরে দেখে নিলো রমা আর শুভঙ্কর।

ম্যাটিনী শো শেষ হওয়ার নির্দেশ জানিয়ে ওয়ার্ণিং বেল বাজলো। রমা রিষ্ট্ ওয়াচের দিকে তাকিয়ে দেখলো ছ'টা বাজতে দশ মিনিট বাকী।

শুভঙ্করও নিজের হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলো। তার ঘড়ি দু'মিনিট দ্রুত চলছিল। রমাকে জিগ্যেস করলে, আপনার ঘড়ি ঠিক টাইম দিচ্ছে?

রমা ঘাড় নেড়ে বললে, হ্যাঁ। একেবারে রেডিও টাইম।

শুভঙ্কর ঘড়ির চাবিটা ঈষৎ টেনে কাঁটাটা দু'মিনিট পিছিয়ে দিলে।

তারপর রমাকে বললে, আপনি একটু দাঁড়ান। আমি পান-সিগারেট খেয়ে আসছি।

বলে অডিটোরিয়ামের সিঁড়ি ভেঙ্গে নামতে যাবে এমন সময় কি মনে করে ফিরে তাকালো রমার দিকে। বললে, চা খাবেন?

রমা বললে, না।

—না কেন, আসুন না।

রমার ইচ্ছা ছিল না চা খাবার। শুভঙ্করের একান্ত অনুরোধে গেল চা খেতে।

হলের কাছাকাছি একটা ছোট কাফেতে এসে উঠলো ওরা দু'জনে।

শুভঙ্কর বয়কে অর্ডার দিলে, দুটো স্পেশাল চা আর দুটো মোগলাই পরোটা।

যথাসময়ে খাবার এসে টেবিলে পৌঁছলো।

রমা বললে, শুধু চা বললেন না কেন? এসব আবার কেন?

শুভঙ্কর বললে, তাতে কি হয়েছে। খেয়ে নিন। বাড়ী থেকে ত কিছু খেয়ে আসেন নি। এখানে তিন ঘণ্টা কাটাতে হবে। সুতরাং খিদে পাবে প্রচুর। খেয়ে নিন।

হাতে সময় কম। ওরা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিলো। তারপর শুভঙ্কর পান কিনলো দুটো। রমার জন্যে একটা, নিজের জন্যে একটা। একটা দামী সিগারেট ধরালো।

ওরা যখন হলের কাছে এলো তখন সেকেণ্ড শো আরম্ভ হয়ে গেছে। ডকুমেণ্টটারী ফিলম্ দেখানো হচ্ছে।

শুভঙ্কর আর রমা দু'জনে অপেক্ষা করতে লাগলো শচীকান্তর জন্যে।

শুভঙ্কর ব্যস্তসমস্তভাবে বললে, ছ'টা দশ হয়ে গেল। এখনো পর্যন্ত শচীকান্তবাবুর দেখা নেই। উনি যে কখন আসবেন তার ঠিক নেই।

রমা বললে, হ্যাঁ, এর মধ্যে যদি এসে পড়েন ত ভাল। তা নাহলে বই আরম্ভ হলে বড় মুস্কিলে পড়তে হবে।

ওরা দু'জনে অধীর আগ্রহ নিয়ে শচীকান্তর জন্যে মুহূর্ত্ত গুণতে লাগলো। হাউসের সামনে দু'একজন দর্শক ছাড়া আর কেউ নেই। সকলেই হলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ছ'টা পনেরো হয়ে গেল। তখনও শচীকান্তর দেখা মিললো না। রমা বললে, উনি যখন এখনো এলেন না তখন আপনি ওনার টিকিটটা বিক্রী করে দিন। মিছিমিছি পয়সা নষ্ট করে কি হবে।

শুভঙ্কর বললে, আর মিনিট দুই অপেক্ষা করা যাক। না এলে তখন যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে।

দু'মিনিট পরেও শচীকান্ত এলো না। অগত্যা শুভঙ্কর একটা

দর্শককে টিকিটটা বিক্রী করে দিলো। সে টিকিট পায় নি। হাউস ফুল। নাইট শোতে আসবে কিনা ভাবছিল। শুভঙ্করের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিতভাবে টিকিটটা পেয়ে বড় আনন্দিত হলো।

ওরা দু'জনে হলের মধ্যে ঢুকে গেল। হলের মধ্যে যাবার আগে রমা বেশ ভাল করে বাইরে একবার তাকিয়ে নিলো। যদি সে শচীকান্তকে দেখতে পায়।

শো আরম্ভ হলো। রমা আর শুভঙ্কর দু'জনে পাশাপাশি বসলো। হলের সব দরজাগুলো একে একে বন্ধ হয়ে গেল। শচীকান্ত তখনো এলো না।

পনের

সাড়ে ছ'টার পর শচীকান্ত অফিস থেকে সিনেমায় এলো। বাইরে কাউকে দেখতে পেল না। রমা ও শুভঙ্কর দু'জনেই ছবি দেখছিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলো, যদি শুভঙ্কর বেরিয়ে এসে তার খোঁজখবর নেয়। দশ মিনিট হয়ে গেলো। কাউকে আসতে দেখলো না।

বড় সাহেবের কি একটা জরুরী কাজ করে দেওয়ার জন্যে তার আসতে দেরী হয়ে গেল।

হলের সামনে কাউকে না দেখে শচীকান্তর মন ভেঙ্গে পড়লো। ভাবলো, রমা বা কেমন মেয়ে ? শুভঙ্কর বা কিরকম লোক। তার জন্যে তারা একটু অপেক্ষা করতে পারলো না !

আবার ভাবলো, রমা হয়ত সিনেমা দেখতে আসে নি। বাড়ীতে ফিরে যাবার ইচ্ছে হলো। কিন্তু গেল না। জয়াদের বাড়ীতে গেল।

জয়া তখন বাড়ী ছিল না। ক্লাবে গেছল। সারাদিন খাটা-খাটুনির দরুন শরীরটা অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। তাই ক্লাবে না গিয়ে শচীকান্ত সটান নিজের বাড়ীতে ফিরলো।

তাকে আসতে দেখে মঞ্জুষা বিস্ময়ের সুরে বললে, ঠাকুরপো, সিনেমায় যাও নি ?

শচীকান্তও কৌতূহলী হয়ে জিগ্যেস করলে, রমা কোথায় বৌদি ?

মঞ্জুষা এবার হাত-পা নেড়ে ডাগর ডাগর চোখ দুটিতে বক্র হাসি ফুটিয়ে বললে, কেন ওনারা দু'জন কখন বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেছে সিনেমায় যাব বলে।

তারপর বললে, কেন তোমার সঙ্গে তাদের দেখা হয় নি ?

শচীকান্ত গম্ভীর স্বরে বললে, না।

গালে হাত দিয়ে মঞ্জুষা আরও অবাক হবার ভাণ করে বিনিয়ে বিনিয়ে বললে, ওমা, তাই নাকি ? এ যে বড় অদ্ভুত ব্যাপার দেখছি ! ……তাত অদ্ভুত হবে, আমি আগে থেকে টের পেয়েছি।

— কি টের পেয়েছ বৌদি ?

নাক পর্যন্ত ঘোমটা টেনে শচীকান্তর কাছে এগিয়ে এসে মঞ্জুষা ফিশ্ ফিশ্ করে বললে, তোমার যেমন মরণ অতবড় মিনসের সঙ্গে সোমত্ত বৌকে কখনো মিশতে দিতে আছে ! মানুষের মন না মতি। কখন কি হয় বলা যায় !

—কিন্তু আমি ত জানি শুভঙ্কর ভাল লোক।

—তোমার অমন ভাল লোকের মাথায় ঝাঁটা মারি। বলি বিয়ে হলে কি হবে তুমি এখনো ছেলেমানুষ। লোক চিনলে না।

শুভঙ্কর আর কিছু না বলে কেবলমাত্র ভারিক্কী গলায় 'হুঁ' বলে নিজের শোবার ঘরে এলো।

আলো জ্বাললো। দেখলো, রমার ছাড়া শাড়ীটা এলোমেলো-ভাবে খাটের ওপর পড়ে রয়েছে।

সারাদিন খাটাখাটুনির জন্যে শরীরটা ক্লান্ত। এবার শুলে ভাল হয়। কিন্তু খাটে জায়গা নেই। রমার শাড়ী জায়গা দখল করে আছে।

শাড়ীটা গুটিয়ে খাটের একপাশে রাখতে যাবে এমন সময়

দেখলো, রমা বাক্সের চাবি নিয়ে যায় নি। ফেলে গেছে। এমন ভুল রমার হয় না। আগে যখন বাইরে কোথাও গিয়েছে তখন চাবিটা সঙ্গে নিয়ে গেছে। আজ কেন ফেলে গেল ?

শচীকান্তর মন বিষণ্ণ। তারপর এই খট্‌কা তাকে আরও উদ্‌ভ্রান্ত করে তুললো।

খাটে শোওয়া হলো না। কি মনে করে চাবি নিয়ে রমার ট্রাঙ্কটা খুলে ফেললো। ভেতর থেকে আগেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল। যাতে আর কেউ আসতে না পারে।

ট্রাঙ্কের ভেতর রমার শাড়ী আর জামা ভাঁজ ভাঁজ করে রাখা আছে। শচীকান্ত একটার পর একটা শাড়ী, ব্লাউজ ও শায়া উঠিয়ে দেখতে লাগলো। কি দেখছে তা সে নিজেই জানে না। হয়ত বা কোনরকম সন্দেহজনক চিঠি—প্রেমপত্র।

শাড়ীজামা তুলতে তুলতে একটা শক্ত জিনিসের গায়ে হাত লাগলো শচীকান্তর। কৌতূহলী হয়ে তাকে শাড়ীর বেড়ার মধ্যে থেকে বের করলো। বাইরে এনে খুলে দেখলো, ছেঁড়া কাপড় জড়ানো একটা বাঁধানো খাতা। রমার পুরোনো দিনের রোজ-নামচা। পুরো খাতাটা লেখায় ভর্তি। দু' একখানা চিঠিও আছে তাতে। একখানা চিঠিতে লেখা রয়েছে—

"প্রিয়তমা রমা,

তুমি যে আমার কত প্রিয় তা শুধু 'প্রিয়তমা' এই সম্বোধনে প্রকাশ করা যায় না অথবা স্পর্শেও না। সেটা একমাত্র জানা যায় মনে—হৃদয়ের গভীর উপলব্ধিতে। ···তুমি আমাকে তোমার সর্বস্ব উজাড় করে দিতে পেরেছ কিনা জানিনা কিন্তু আমি তোমাকে আমার সর্বস্ব দিয়ে ভেবেছি তুমি আমার জীবনের সর্বস্ব···

শচীকান্ত পড়তে পড়তে থেমে গেল। তার হৃৎপিণ্ডটায় কে যেন হাতুড়ী দিয়ে এক ঘা মারলো। দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো। ক্ষুব্ধ জলধির মত তার মন উৎক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো।

খাতা বন্ধ করে বসে রইলো খানিকক্ষণ। তারপর মনটা একটু স্থির করে পড়া শুরু করে দিলো,—

"…রমা, আমরা ছ'জনেই কোলকাতায় আছি। অথচ মনে হচ্ছে আমরা কত দূরে দূরে……আমি যদি পাখী হতুম তাহলে উড়ে গিয়ে এক নিমেষে তোমার হৃদয়কুঞ্জে পাড়ি জমাতুম। কিন্তু হায়, দুঃখু সেইখানে, আমি যে পাখী নই। ইতি—

তোমারই শুভ।"

প্রথম চিঠিটা পড়ার পর শচীকান্ত ভাবলো, শুভঙ্করের মনে এত ছিল? ওর দ্বিতীয় চিঠিটা পড়ার প্রবৃত্তি হলো না। শুভঙ্করের প্রতি ঘেন্নায় তার সর্বশরীর জ্বলে যেতে লাগলো।

এবার ঠিক করলো রমার রোজ-নামচাটা পড়বে। পড়তে শুরু করলো,—

"আজ ৩রা চৈত্র, ১৩৫৫ সাল। সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টা। পাশের বাড়ীর ছাদের ওপর টবে বসানো বেলফুলের গাছে প্রচুর ফুল আর কুঁড়ি ধরেছে। শান্ত দখিনা বাতাসে কোমল গন্ধ ভেসে আসছে। আমার মন-প্রাণ ভরিয়ে দিচ্ছে আনন্দে। কিন্তু এই কি যথার্থ সুখ দিতে পারছে? না, মোটেই না। ফুলের গন্ধে মানুষ সাময়িক তৃপ্তি পায়। মনের আসল সুখ, হৃদয়ের প্রকৃত তৃপ্তি পেতে গেলে মানুষের প্রেম চাই। এতদিন পরে শুভঙ্করের মধ্যে আমি তা খুঁজে পেয়েছি……"

শচীকান্ত পড়তে পড়তে থেমে গেলো। "এতদিন" শব্দটির ওপর বারংবার চোখ বোলাতে লাগলো।

তারপর ডায়েরীর ছ'চার পাতা ওল্টাতে শুরু করলো। এক জায়গায় দেখলো, লাল ও সবুজ কালি দিয়ে লেখা কয়েকটি লাইন, "……আজ ১০ই চৈত্র, ১৩৫৫ সাল। শুভঙ্কর তুমি জাননা আজ আমি কতখানি তৃপ্তি পেয়েছি। এতদিন ধরে তোমাকে দূরে দূরে দেখে যে সুখ পাই নি আজ কাছে এসে তাই পেলুম। এতদিন মক্ষিকা কেবল ফুলের চারিধারে ঘুরে বেড়িয়েছে। আজ

ফুলের বুকে তার কামনার ধন খুঁজে পেয়েছে। ভাবছি আজকের দিনটা আমার জীবনে সত্য ও পূর্ণ। আজকের ভাবনা আমার জীবনে সার্থক ও সুন্দর। আগেকার জীবনের দিনগুলি ব্যর্থ ও অসুখী মনে হচ্ছে আজকের তুলনায়। আজ তোমার স্পর্শ পেয়ে যে সুখ ও শান্তি পেলুম তা ভাষায় বোঝাতে অক্ষম। তাই তোমাকে চিঠি না দিয়ে আমার নিত্যকার রোজনামচার পাতায় সংক্ষিপ্তভাবে লিখে রাখছি……হয়ত আমাদের ভবিষ্যৎ জীবনের রঙীন দিনে এসব কিছুটা কাজে লাগবে……"

শচীকান্ত পড়া থামিয়ে ডায়েরীটা বন্ধ করে খানিকক্ষণ চিন্তা করলো। মুখে বিরক্তির কুটিল ভাব ফুটিয়ে অস্পষ্ট ভাষায় বলে উঠলো, ছি! ছি!!

ইচ্ছে হচ্ছিলো, ডায়েরীটাকে একটা দেশলাই কাঠি জ্বালিয়ে নস্যাৎ করে দেয়। পরে ভাবলো, না, যে যা করছে তা করুক। সে সর্ববিষয়ে থাকবে নির্লিপ্ত।

শচীকান্ত রমার ট্রাঙ্কটা যেমনভাবে গোছানো ছিল তেমনিভাবে গুছিয়ে রেখে দিলো। চাবিটা শাড়ীর নীচে রাখলো।

ঘরের দরজা তেমনিভাবে বন্ধ রয়েছে। শচীকান্ত বাইরে বেরুলো না। হাত-মুখ ধুলো না। জলখাবারও খেলো না।

শচীকান্তকে ঘর থেকে বেরুতে না দেখে বেলা এসে দরজায় কড়া নাড়লো।

শচীকান্ত তন্দ্রাভিভূত। কড়ার শব্দে তন্দ্রা কাটলে বিছানা ছেড়ে উঠে বসলো। শুধোলে, কে কড়া নাড়ে?

বেলা বললে, আমি। দরজা খোলো। চা খাবে না?

শচীকান্ত বললে, না। খাবো না। আমি ঘুমুচ্ছি। আমাকে বিরক্ত করিস না।

শচীকান্ত আবার বিছানায় শুয়ে পড়লো। উঠলো না। দরজাও খুললো না।

বেলা দরজায় দু'একবার ধাক্কা দিয়ে ফিরে এলো রান্নাঘরে।

বকুলরাণীকে বললে, ছোড়দা দরজা খুললো না। চা খাবে না। এখন ঘুমুবে।

বকুলরাণী অবাক হয়ে একবার তাকালেন বেলার দিকে। বললেন, ওর কি কোন অসুখ করেছে?

বেলা বললে, কি জানি!

বকুলরাণী তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে এলেন। শচীকান্তর ঘরের সামনে এসে দরজায় আঘাত করতে লাগলেন।

শচীকান্ত এবার সাড়া না দিয়ে চুপচাপ শুয়ে রইলো। সে ঘুমোয় নি। কিন্তু সাড়া দিলো না।

বকুলরাণীর কণ্ঠস্বর চাপা কান্নায় ফুঁফরে উঠলো। বললেন, বাবা শচী, এখন ঘুমুচ্ছিস্ কেন? কি হলো তোর?

সাড়া নেই। বিছানার ওপর টান টান হয়ে শুয়ে রইলো শচীকান্ত।

বকুলরাণী নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন রান্নাঘরে।

বেলা জিগ্যেস করলো, কি হলো মা? দাদা দরজা খুলেছে?

বকুলরাণী ঘাড় নাড়লেন। বললেন, না, খুললো না।

বেলা বললে, দাদার শরীর খারাপ করে নি মা। নিশ্চয়ই বৌদির ওপর রাগ করেছে।

বকুলরাণী বললেন, তা কি করে জানবো মা! আমিত ভগবান নই।

মঞ্জুষা অমনি ফোড়ন কাটলো, অত যদি রাগ ত পরের সঙ্গে বৌকে পাঠানো কেন?

বকুলরাণী প্রথমে কিছু বলতে চাইলেন না। পরে গম্ভীর মেজাজে বললেন, আজকালকার সব ছেলেমেয়ে নিজেরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। ভাল-মন্দ বিচার করার কোন ক্ষমতা নেই।

ষোল

শচীকান্ত বিছানায় চুপ করে শুয়েছিল। শোয়াই সার। ঘুম এলো না। নানারকম ভাবনায় তার মন উত্তক্ত হয়ে উঠলো। একবার ভাবলো রমার রোজ-নামচার কথা। আর একবার ভাবলো শুভঙ্করের প্রেমপত্রের বিষয়বস্তু। মনে পড়লো, সে বিয়ের আগে জয়ার সঙ্গে প্রথম যখন রমাদের বাড়ী গেছলো তখন তার ওপর শুভঙ্করের নজর কেমন যেন বেমানান লেগেছিল। তার কারণ খুঁজে বের করতে এখন আর দেরী হল না।

তারপর ভাবলো তার বৌদি মঞ্জুষার কথা। মঞ্জুষা বললে, 'বিয়ে হলে কি হবে, তুমি এখনো ছেলেমানুষ। লোক চিনলে না।'

আবার ভাবলো, সেদিন তুপুরে রমা দরজা বন্ধ করে বসে শুভঙ্করের সঙ্গে কি কথা বলছিল আর কি করেছিল তা কে জানে!—

'স্ত্রীয়াশ্চরিত্রম্ পুরুষস্য ভাগ্যং
দেবা ন জানন্তি কুত মনুষ্যঃ।'

ভাবতে ভাবতে শচীকান্তর মন রমা আর শুভঙ্করের প্রতি বিদ্রোহ হয়ে উঠলো। একবার মনে করলো, হাফ্‌টাইমের সময় রাধা সিনেমার কাছে যাবে। গিয়ে দেখবে শুভঙ্কর যদি বাইরে বেরোয়। শুভঙ্করকে দেখতে পেলে সেখানেই এক হাত নিয়ে নেবে। উত্তেজিত হয়ে ভেতর থেকে ছিট্‌কিনি দেওয়া দরজার কাছে গেল।

কিন্তু দরজা খুললো না। ছিট্‌কিনির ওপর হাতটা চেপে রেখে দাঁড়িয়ে রইলো খানিকক্ষণ। পরে বিছানায় এসে আবার শুলো। আবার ভাবনা। আবার উত্তেজিত হওয়া। শেষে ঘুম—গভীর ঘুম।

ঘড়িতে সাড়ে ন'টা বাজলো। রমা সিনেমা দেখে এলো। শচীকান্ত তখনো ঘুমুচ্ছে।

শুভঙ্কর রমাকে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে নিজের বাসায় চলে গেল।

রমা তাকে বসতে বললো। সে বললে, না, আজ বসবো না। তাহলে অনেক রাত হয়ে যাবে বাড়ী ফিরতে। বাড়ীতে বাবা হয়ত ভাবছেন। যাই তাহলে।

শুভঙ্করকে বিদায় জানিয়ে রমা ওপরে উঠে এলো। মঞ্জুষা ও বেলা রমাকে দেখলো। কিছু বললো না।

নিজের ঘরে এসে দেখলো, দরজা বন্ধ। দরজায় ধাক্কা দিলো—কড়া নাড়লো। তবু খুললো না শচীকান্ত। সহজে ঘুম ভাঙ্‌লো না।

বেলা এসে বললে, ছোড়দা ঘুমুচ্ছে।

রমা বললে, এখন এই অসময়ে ঘুমুচ্ছে কেন ?

বেলা বললে, কি জানি !

—তুমি ডাকো না ভাই ঠাকুরঝি।

রমার কথায় বেলা দরজার কড়া ধরে খুব জোরে জোরে তিন-চারবার নাড়লো। তাতেও দরজা খুললো না।

শেষে 'ছোড়দা ছোড়দা' বলে চীৎকার করে ডাকতে কিছুক্ষণ পরে শচীকান্ত বিছানা থেকে উঠে দরজা খুলে দিলো।

দরজা খুলতেই রমার সঙ্গে মুখোমুখি হলো।

শচীকান্ত রমার মুখের দিকে না তাকিয়ে বাথ্‌রুমে চলে গেলো। সেখানে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরে এলো।

ইতিমধ্যে রমা ঘরে এসে জামা কাপড় ছাড়তে লাগলো। খাটের কোণে জড়ো করা পুরোনো ময়লা কাপড় সরাতে দেখলো, ট্রাঙ্কের চাবি পড়ে রয়েছে। সে নিয়ে যেতে ভুলে গেছল। শুভঙ্করের যে তাগিদ দেওয়ার ধুম, তাতেকরে ভুল হওয়া ত স্বাভাবিক।

শচীকান্তকে দেখে রমা বললে, তুমি কোথায় ছিলে ছ'টার সময় ? আমরা তোমার জন্যে কতক্ষণ ওয়েট্ করলুম।

শচীকান্ত মনে করলো উত্তর দেওয়া নিরর্থক। কিন্তু কাছে যতক্ষণ আছে উত্তর না দিয়ে পারে না।

বাধ্য হয়ে দিতে হলো উত্তর। বললে, আমার অফিস থেকে যেতে একটু দেরী হয়েছিল। সাড়ে ছ'টার সময় গিয়ে দেখলুম তোমরা বাইরে নেই। তখন বাসায় চলে এলুম। কি করবো বাইরে দাঁড়িয়ে থেকে।

—তুমি আসছো না দেখে আমি শুভঙ্করবাবুকে টিকিটটা বিক্রি করতে বললুম।

শচীকান্ত এবার শ্লেষের সঙ্গে বললে, অত তাড়াতাড়ি বিক্রি করলে কেন? একটু অপেক্ষা করতে ত পারতে?

রমা বললে, শো যে আরম্ভ হয়ে গেছল।

—কিন্তু আমিত তোমাদের বলে রেখেছিলুম, আমার যেতে একটু দেরী হবে।

—এত দেরী হবে তাকি জানা ছিল। তাহলে আজ সিনেমায় যেতুম না।

শচীকান্ত এবার কিছু না বলে রমার দিকে একবার ঝিলিক নয়নে তাকিয়ে বললে, হুঁ।

রমা বললে, তাই বুঝি তুমি রাগ করে এতক্ষণ পর্যন্ত ঘরে দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছিলে?

শচীকান্ত বললে, রাগ হয়তো করেছি তবে অন্য কারণে। বলেই শচীকান্ত নিজেকে সংযত করে নিলো। তার ইচ্ছে ছিল রমা যা করছে করুক। ওর কাজে কোনরকম বাধা দেবে না। কিন্তু তার মন অবোধ। সংযমের শত বন্ধন ডিঙিয়ে সে নিজের কর্তৃত্ব জাহির করতে ব্যগ্র হলো।

রমা বললে, কি কারণে?

শচীকান্ত আর ও বিষয়ে কোন কথা বললো না। মুখের কথা মনে মিলিয়ে গেল, পরে জানতে পারবে।

রমার কানে মনের সে অব্যক্ত ভাষা গেলো না।

সেদিন রাতে শচীকান্তর ভালভাবে ঘুম হলো না। ঘেন্না ও লজ্জায় তার মস্তিষ্ক কম্পমান। ছি! রমার পাশে শুতেও মন

চাইছিল না। কিন্তু কি করবে। শুতেই হবে। আর একটা রাত মাত্র। তারপর যা হয় সে করবে।

মাঝরাতে ঘুম ভেঙ্গে যেতে রমা অধীর হয়ে শুধোলো, বলো না কি কারণে?

শচীকান্ত তথাপি নিরুত্তর রইলো।

চোখ বুজিয়ে ঘুমের ভাণ করে শুয়ে থাকল।

শ্রাবণ মাসের বর্ষণমুখর রাত। বাইরে মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে। সেই শব্দে রমার কথা শচীকান্তর কানে গেল না।

ক্রমে ভোর হয়ে এলো। শচীকান্ত বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো। রমা শচীকান্তর ভাবান্তর দেখে বড় দুঃখ পেল।

খানিকপরে শচীকান্ত বাজারে গেল। পথে জয়ার সঙ্গে দেখা। জয়া শচীকান্তকে দেখে লাফিয়ে উঠলো। পরে দৃঢ় আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করলে। বললে, এতদিন তুই কোথায় ছিলি?

শচীকান্ত বললে, কাল ত এখানে এসেছিলুম। তোর দেখা পাই নি।

—আমি বাড়ীতে ছিলুম না।

জয়া শচীকান্তকে আলিঙ্গন করলো বটে কিন্তু প্রাণের স্পর্শ পেল না সে আলিঙ্গনে। তাই কেমনধারা সন্দেহপরায়ণ মন নিয়ে প্রশ্ন করলো শচীকান্তকে, আজ তোর কি হয়েছে বলতো? বৌদির সঙ্গে ঝগড়া করেছিস্ বুঝি?

শচীকান্ত বললে, না।

জয়া বললে, মিথ্যে কথা বলিস নি। তোর চেহারা দেখে বুঝতে পারছি আজ তুই সত্যিই অসুখী।

শচীকান্ত উত্তর দিলো না। প্রিয় বাল্যবন্ধু জয়ার কথাটা তার মর্মকে পীড়া দিলো। বার বার জয়ার শেষ কথাটা তার মনকে নানাচিন্তায় আবৃত করে রাখলো।

সতের

পরদিন শচীকান্ত অফিসে গেল। ভালভাবে কাজে মন দিতে পারল না। বড়বাবু বললেন, শচীকান্ত, তোমার মানসিক অবস্থা বড় মন্দ। তুমি ছুটি নাও দিনকতক।

শচীকান্ত কোন উত্তর দিলে না।

অফিস থেকে আজ একটু সকাল সকাল বেরিয়ে সে বাড়ী গেলো না। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে এলো। মাকে প্রণাম করে গঙ্গার ধারে খানিকক্ষণ বসলো। কুলুকুলু শব্দে গঙ্গার মনমাতানো প্রাণের সঙ্গীত তাকে ক্ষণিকের জন্যে তৃপ্তি দিলো।

পরে রমার কথা চিন্তা করে তার সর্বাঙ্গ বিষিয়ে উঠলো। ভাবলো, এ জীবন ব্যর্থ। একে রেখে কী লাভ? যার স্ত্রী ব্যাভিচারিণী তার জীবন ধারণ করা মূর্খতা। সারাজীবন দুঃখ ও অশান্তি, কলঙ্ক ও লোকনিন্দার বোঝা মাথায় নিয়ে সমাজের পথে চলতে হবে। তাই জীবন রাখার চাইতে জীবন বিসর্জনই শ্রেয়।

এই চিন্তার পর গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া মনস্থ করলো। ক্ষণকাল পরেই সে যেন কার অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সে স্বর তাকে উদ্দেশ করে বললে, ওরকম কাজ করিস নি। মানুষ হয়ে সাধারণ একটা মেয়েছেলের ব্যর্থ ভালবাসার জন্যে মৃত্যুবরণ করছিস্! ধিক্ তোর মানুষ জীবন! তুই পুরুষ না কাপুরুষ! ভেবে দেখ্, বিবাহিত জীবনের চেয়ে আরও বড়—আরও সুখের জীবন আছে।

যেমন ভাবা অমনি শচীকান্তর মন-প্রাণ এক অভাবিত আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

গঙ্গায় জীবনদান করা হলো না। ফিরে এলো মায়ের মন্দিরে। এদিক ওদিক তাকালো। কোন চেনাপরিচিত মানুষজন দেখতে পেল না।

আবার গঙ্গার ঘাটে গেল। যদি তার পরিচিত কেউ সেখানে থাকে। কিন্তু সেখানে গিয়েও কাউকে দেখলো না। আবার মন্দিরে এলো। কালী মায়ের সামনে দাঁড়িয়ে প্রণাম করলো। বললে, মা তোর ইচ্ছেই পূর্ণ হোক। তুই চৈতন্যময়ী। এ বোধ হয় তোরই শুভ ইঙ্গিত উন্নততর জীবনের জন্যে।

সেদিন অনেকরাত করে শচীকান্ত বাড়ী ফিরলো। বাড়ীর সকলে ভেবে অধীর। অনেক রকম প্রশ্ন করলো তারা। শচীকান্ত বললে, কোন এক বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে দেরী হয়ে গেল।

রমা আবার সেই আগের দিনের রাত্রির মত অসহায় ভাব নিয়ে নিতান্ত অপরাধীর মত প্রশ্ন করলে, বলো না তুমি কি কারণে রাগ করেছ? আমি তোমার কি করেছি?

শচীকান্ত আজও নিরুত্তর।

পরের দিন অফিসে গেল। সারাদিন কাজ করলো। একবার অফিসে বসে ভাবলো জয়ার কথা। জয়ার বাবার বন্ধু আশুতোষবাবুর গুরু তেজানন্দের যোগদা-আশ্রম আছে হরিদ্বারে। সেখানে গেলে কেমন হয়? সংসার তার আর ভাল লাগছে না। সে চায় মুক্তি। পঙ্কিল সরোবরে ডুবে থাকতে রাজী নয়.

রমা তার কাছে কত প্রিয় ছিল। কিন্তু আজ সেই তার কাছে চিরশত্রু। সে অসতী। সে পরপুরুষে অনুরক্তা। একবার ভাবলো, রমাকে ক্ষমা করবে। মাত্র একদিনের একটা ঘটনাকে উপলক্ষ্য করে কারও চরিত্র কলঙ্কিত করা উচিত নয়। হয়ত সেদিন সত্যিই রমা নিষ্পাপ ছিল। তার সিনেমাহলে পৌঁছতে দেরী হয়ে গেছল বলে হয়ত সে শুভঙ্করকে টিকিটটা বিক্রি করতে বলেছিল। সুতরাং এক্ষেত্রে তাকে বিশেষ দোষী করা যায় না।

আবার পরমুহূর্তে ভাবল, রমার লেখা ডায়েরী আর শুভঙ্করের প্রেমপত্র। সেগুলো ত ভোলা যায় না। তার প্রতিটি শব্দ যে পঙ্কিল—পূতিগন্ধযুক্ত। যতবার ভাবে ততবারই তার মন-প্রাণ ঘেন্নায় কুঞ্চিত হয়ে পড়ে।

সেদিনই দুপুরে পোস্টাফিসের পাশ বই থেকে কিছু টাকা তুলে নিলো শচীকান্ত। বাসায় একবার ফিরলো।

রমার অসাক্ষাতে চামড়ার একটা স্যুটকেশে কিছু কাপড়-জামা নিয়ে বেরিয়ে পড়লো বাড়ী থেকে। তার মা, বোন, ভাই, বাবার সঙ্গে দেখা হলো না।

আসবার সময় রমা একবার জিগ্যেস করলো, তুমি অফিস থেকে এসে কিছু খেলে না দেলে না আবার কোথায় বেরুচ্ছো?

শচীকান্ত কেবল বললে, স্যুটকেশটা ড্যামেজড্ হয়েছে। সারিয়ে আনছি।

বাড়ী থেকে বেরিয়ে সোজা হাওড়া স্টেশনে এসে হরিদ্বারের টিকিট কেটে ডেরাডুন এক্সপ্রেসে উঠে বসলো।

নির্দিষ্ট সময়ে গাড়ী ছাড়লো। গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শেষবারের মত রহস্যঘেরা আজবনগরী কোলকাতাকে এক-বার ভালোভাবে দেখে নিলো।

আঠার

পুণ্যতীর্থ হরিদ্বারে নেমেই শচীকান্ত একটা ধর্মশালায় এসে উঠলো। পরের দিন অনেক সন্ধান করে তেজানন্দের আশ্রমে এলো।

প্রিয়দর্শন দিব্যকান্তি গেরুয়াধারী তেজানন্দ শচীকান্তকে দেখে বললেন, কি চাই আপনার?

শচীকান্ত বললে, আমি আপনার আশ্রমে থাকতে চাই।

—কি নাম আপনার?

—অনিল দাস।

আসল নাম গোপন করলো শচীকান্ত। কি জানি যদি বাড়ীর লোক জেনে ফেলে।

তেজানন্দ পুনরায় প্রশ্ন করলেন, আপনি বিবাহ করেছেন?

—না।

—মা-বাবা আছেন ?

—না।

তেজানন্দ এবার অক্লেশে বললেন, আমার আশ্রমে আপনি থাকতে পারেন তবে এখানে খুব কঠোর নিয়ম মেনে চলতে হবে। পারবেন ?

শচীকান্ত ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

তেজানন্দ বললেন, বেশ তাই হোক !

তারপর কি ভেবে বললেন, আপনার বাড়ী কোথায় ?

—কোলকাতায়।

—সেখানে আর কেউ নেই ?

—দাদা-বৌদি আছেন।

—তাঁরা জানেন আপনি এখানে এসেছেন ?

—তাঁরা না জানলেও চলে।

—তার মানে ?

শচীকান্ত নীরব! কোন উত্তর দিলো না।

তেজানন্দ বললেন, আপনি কি রাগ করে চলে এসেছেন ?

শচীকান্ত বললে, না—রাগ করে আসি নি। আমি দাদাকে বলেছি বিয়ে করবো না। সন্নেসী হয়ে ঈশ্বরের আরাধনা করবো—সমাজ ও জাতির সেবা করবো।

—দাদা কি বললেন ?

—কিছু বলেন নি।

—আপনার কথা উত্তম। আপনি আমার আশ্রমে থাকতে পারেন। কিন্তু আমরা প্রথমে কাউকে সন্ন্যাস দিই না। দীর্ঘ বারো বছর সাধনার পর তবে সন্ন্যাস দিই। আপনার বেলাও তার কোন ব্যতিক্রম হবে না।

—আমি আপনার আদেশ মাথায় তুলে রাখছি।

—বেশ, আগামী পূর্ণিমার দিন ভোরবেলায় আমি আপনাকে দীক্ষা দেবো। আপনি ঐ দিন প্রস্তুত থাকবেন। মনে সর্বদা পবিত্র চিন্তা রাখবেন।

পরে পুর্ণিমার দিন গঙ্গাস্নান করে শচীকান্ত তেজানন্দের ঘরে এসে বসলো।

ঘরে আর কেউ ছিল না। সে আর তেজানন্দ।

পূবমুখো হয়ে বসলো শচীকান্ত। তেজানন্দ বসলেন পশ্চিম-মুখো হয়ে।

তেজানন্দ শচীকান্তকে গায়ত্রী মন্ত্র জপ্ করতে বললেন। তারপর বললেন ব্রহ্মস্তব আবৃত্তি করতে।

তারপর বললেন, প্রণামমন্ত্র জপো।

সর্বশেষে কানে কানে ইষ্টমন্ত্র দিলেন। বললেন, এই মন্ত্র তুমি দিনরাত যখনি সময় পাবে জপবে। এতে শান্তি পাবে। আর সাধনার উন্নতি হলে পরে অভিষেক হবে।

মন্ত্র দেওয়ার পর শচীকান্তকে বললেন, ব্রহ্মনাড়ীতে ধ্যান করবে। করো দেখিনি।

শচীকান্ত ধ্যান করলো।

তেজানন্দ বললেন, আমাকে ধ্যানচোখে দেখতে পাচ্ছ?

শচীকান্ত বললে, না।

—পরে পারবে।

তারপর বললেন, প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় গায়ত্রী ও ইষ্ট মন্ত্র জপবে। সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মস্তোত্র ও প্রণামমন্ত্র ও আরতি করবে। এতেকরে মন থেকে সর্ব পাপ ও ভয় দূর হবে। মন উন্নত ও পবিত্র-মার্গে অবস্থান করবে। জীবনে শান্তি পাবে। ইষ্টলাভ সহজ হবে।

দীক্ষার পর তেজানন্দ আসন ছেড়ে উঠে পড়লেন। শচীকান্তকে বললেন, এখন আসতে পারো।

শচীকান্ত রুদ্ধ দরজা খুলে বাইরে এলো। প্রভাতসূর্যের শান্তস্নিগ্ধ কিরণে আশ্রমের পরিবেশ সোনালী হয়ে উঠলো।

উনিশ

বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা এলো। শচীকান্ত অফিস থেকে ফিরলো না দেখে রমাও বকুলরাণী চিন্তায় অধীর হয়ে উঠলো।

বাণীপ্রসাদের কানে গেল ব্যাপারটা। বাণীপ্রসাদ বললেন, হয়ত কোথাও কোন বন্ধুর বাসায় গিয়ে থাকবে। তার ফিরতে রাত হচ্ছে।

ক্রমে রাত্রি এলো। চলে গেলো। সকাল হলো। সারাদিন গেলো। আবার সন্ধ্যে এলো। শচীকান্তর দেখা মিললো না।

এবার বাড়ীর সকলেই চিন্তিত হলো!

বকুলরাণী বাণীপ্রসাদকে বললেন, যদি কারও বাড়ী গিয়েই থাকে তাহলে কালই ফিরতো। আর যদি না ফিরলো ত আজ নিশ্চয়ই ফিরতো। বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে শুধু শুধু অফিস কামাই করার ছেলে শচী নয়। নিশ্চয়ই কোন বিপদ-আপদ হয়ে থাকবে। তুমি বরং পুলিশে একবার খবর দাও।

সুধাকান্ত বললে, কাল অফিসে গিয়ে একবার খোঁজখবর নেবো। তারপর যা হয় তাই করা যাবে।

বাণীপ্রসাদ বড় ছেলের কথায় সায় দিয়ে বললেন, তোমরা যা ভাল বুঝবে তাই করবে। তবে তাড়াতাড়ি করা চাই কিন্তু। দেরী হলে ক্ষতি হতে পারে। হয়ত কোথাও কোন বজ্জাত গুণ্ডার হাতে সে পড়েছে। সে ওকে আটকে রেখে গার্জেনের কাছে পয়সা চাইতে পারে। আজকাল কোলকাতার মতন শহরে ওরকম ঘটনা অনেক ঘটেছে।

বাণীপ্রসাদের কথা শোনামাত্র বকুলরাণীর গায়ে আতঙ্কের শিহরণ খেলে গেল। গলার স্বর আরও নীচু করে বললেন, দেখ্ বাবা সুধা! তাড়াতাড়ি যাহয় একটা কিছু কর।

সুধাকান্ত বকুলরাণীকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি অতো ভেবো না মা। যা করবার তা ঠিকই করবো।

কুড়ি

পরদিন সুধাকান্ত শচীকান্তর অফিসে এলো। সেখানে কেউ-ই শচীকান্তর খবর বলতে পারলো না। সকলে বললে, কাল সারাদিন অফিস করেছে; বিকেলে যেমন বাড়ী যায় তেমনি গিয়েছে।

সুধাকান্ত শচীকান্তর বন্ধু জয়ার বাড়ীতে খোঁজ নিলো। সেখানেও কোন খবর পেল না। গেল তার শ্বশুর বাড়ীতে। সেখানেও কোন খবর নেই। শুভঙ্কর আসতে তাকে জিগ্যেস করে কিছুই জানতে পারলো না শচীকান্ত সম্বন্ধে।

অগত্যা থানার শরণাপন্ন হলো।

শুভঙ্কর বললে, খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে।

সুধাকান্ত বললে, না। পুলিশে সংবাদ দেওয়াই ঠিক হবে।

পুলিশ অফিসার সত্যব্রত সুধাকান্তকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে নানারকম ঘরোয়া প্রশ্ন জিগ্যেস করলো। বললে, আপনার ভাইয়ের মাথার কোন রকম দোষ ছিল কি?

সুধাকান্ত বললে, না।

—বিয়ের আগে যেরকম ছিল বিয়ের পরে কি তার মনের ভাব বদলে গেছলো?

—না।

—পরিবারের সঙ্গে সদ্ভাব কেমন ছিল?

—ভালই।

—আচ্ছা, উনি যেদিন বাড়ী থেকে চলে গেলেন সেদিন ওনার চালচলন বা কথাবার্ত্তায় কোন রকম পরিবর্তন লক্ষ্য করেছিলেন কি?

—না, তেমন কিছু চোখে পড়ে নি।

এমনি আরও অনেক প্রশ্ন জিগ্যেস করতে লাগলো সত্যব্রত। সুধাকান্ত তার প্রত্যেকটির সদুত্তর দিলে।

শেষে সত্যব্রত বললে, শচীকান্তবাবুর স্ত্রী রমাদেবীর কাছ থেকে কিছু জানতে চাই।

পরদিন রমা সুধাকান্তর সঙ্গে পুলিশ অফিসারের অফিসে এলো।

সত্যব্রত বললে, আপনার নাম রমাদেবী ?

রমা ঘোমটা টেনে বললে, আজ্ঞে হ্যাঁ।

আপনি আপনার স্বামীর অন্তর্ধানের কথা কিছু জানেন ?

—না।

—বাড়ী থেকে যাবার আগে আপনার সঙ্গে তাঁর কোনরকম কথা কাটাকাটি হয়েছিল ?

—না। মনে পড়ছে না।

—ভাল করে ভাবুন রমাদেবী। আমি wait করবো আপনার জন্যে।

রমার মনে পড়লো সিনেমা দেখা উপলক্ষ্যে সেদিনের সেই ঘটনা।

কিন্তু তবু মনটা সংযত করে বললে, না। তেমন কোনো ব্যাপার ঘটে নি।

—আচ্ছা, আপনাদের বিয়ে হয়েছে কতদিন আগে ?

সিগারেট ধরাতে ধরাতে চেয়ারে একবার আরামে হেলান দিয়ে জিগ্যেস করলো সত্যব্রত।

রমা বললে, মাত্র তিন মাস হলো।

—এই তিনমাসের মধ্যে আপনাদের কারুর একবারও কি temper loose হয় নি ?

—না।

—আশ্চর্য।

বলে সত্যব্রত রমার মুখ, চোখ ইত্যাদি ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলো। ঠিক যেন ডাক্তার। হ্যাঁ, সত্যব্রত ডাক্তারই বটে। এ রোগ হলো অপরাধ। রোগ কি ধরণের তাই দেখে সেই মত ওষুধ দেওয়া আর কি। রোগীকে ওষুধ দেওয়ার আগে তার

রোগলক্ষণ ভালভাবে পরীক্ষা করা উচিত। অপরাধ রোগ বিশেষজ্ঞ সত্যব্রত রমাকে বিশেষভাবে জেরা করে তার কাছ থেকে কিছু পেল না বটে কিন্তু মনে মনে সন্দেহ করলো রমাকে।

রমার দৃষ্টির মধ্যে একটা অদ্ভুত লক্ষণ ধরে ফেললো। সে লক্ষণ বড় সন্দেহজনক।

যাহোক, সত্যব্রত আর রমাকে কোনরকম জেরা করলো না। বললে, আপনি এবার যেতে পারেন।

পরে সুধাকান্তর দিকে তাকিয়ে একমুখ সিগারেটের কুণ্ডলী পাকানো ধোঁয়া ছেড়ে বললো, জানেন, ব্যাপারটা বড় গোলমেলে ঠেকছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে আমরা এর একটা খুঁটিনাটি তদন্ত চালাবো। তখন আপনাকে সবকথা জানাবো।

সুধাকান্তর মুখ ঈষৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে, আপনি শচীকান্তর পালানো সম্বন্ধে কি মত পোষণ করেন? ওকে কি গুণ্ডারা আটকে রেখেছে না নিজে কোথাও পালিয়ে গেছে?

সত্যব্রত এক মুখ হাসি নিয়ে চিবিয়ে চিবিয়ে উত্তর দিলে, তদন্ত না করে এ বিষয়ে হঠাৎ কোনরকম মতামত দেওয়া উচিত হবে না। আপনার দু'রকম সন্দেহ সত্য হতে পারে।

সুধাকান্ত ও কথার ওপর আর কোন উচ্চবাচ্য না করে চলে এলো বাড়ীতে। রমাও সঙ্গে এলো।

আসার সময় সত্যব্রতকে দু'হাত তুলে নমস্কার জানালো সুধাকান্ত ও রমা।

সত্যব্রত প্রতি নমস্কার করে বললে, আমি যতটা সম্ভব এই ব্যাপারটা গোপন রেখে ভেতরে ভেতরে তদন্ত চালাব। খবর পেলে আপনাদের জানাতে দ্বিধা করবো না।······তবে এ ব্যাপারে আমি আপনাদের আরও সাহায্য চাই। দরকার হলে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি।

সুধাকান্ত কিছু বললে না তবে চোখমুখের ভাব দেখে মনে হলো যেন সে সত্যব্রতর কাছে সকল সময়ের জন্য মুক্ত। সে যা জানতে

চাইবে তাই প্রাণখুলে বলবে। কোন কিছু গোপন করবে না। মোটকথা যে কোন প্রকারে হোক প্রাণসম প্রিয় ছোটভাইকে সে কাছে পেতে চায়।

একুশ

সুদীর্ঘকাল তদন্ত চালিয়েও সত্যব্রত আসল মানুষটির সন্ধান পেল না। দু'চারজন দাড়িওলা মানুষকে ধরে অনেকবার নাস্তানাবুদ করেছে।

সুধাকান্ত শচীকান্তর একটা ছবি দিয়েছিল। ছেলেবেলাকার ছবি। তার ওপর নির্ভর করে সত্যব্রত তার পুলিশী তদন্ত চালান। ফল হলো না কিছুই।

সুধাকান্তও নিরাশ হলো। বকুলরাণী ও বাণীপ্রসাদ ভেঙ্গে পড়লেন।

দিনকতক পরে বকুলরাণী অসুখে পড়লেন। সুধাকান্তর একান্ত প্রাণঢালা সেবা পেয়ে রোগমুক্ত হলেন।

খলমনা মঞ্জুষার মনে আনন্দের জোয়ার খেলে গেল। স্বামীকে বললে, ভাই গেছে যাক, তার জন্যে এমনধারা মন খারাপ করছ কেন ?······

এবার বৌটাকে বাপের বাড়ীতে তুলে দিয়ে এসো। ওকে আর এখানে রাখার কোন মানে হয় না।

সুধাকান্ত জবাব দেয় নি মঞ্জুষার কথা শুনে।

পরে তেজেন্দ্রর চেষ্টায় ও বাণীপ্রসাদের ইচ্ছায় রমা বাপের বাড়ী চলে গেল।

বকুলরাণী প্রথমটা আপত্তি তুললেন। বললেন, ছেলে চলে গেল। বৌটাও চলে যাবে। তবে আমি আর কি নিয়ে থাকবো ?

বকুলরাণীর কান্না সার্থক হলো না।

রমা তেজেন্দ্রর কাছেই ফিরে গেল। সেই থেকে সে তেজেন্দ্রর কাছেই আছে।

বাইশ

দশ বছর কাটলো। শচীকান্ত বাড়ী ফিরলো না। রমা এখন সন্তানের জননী। ছেলের বয়স ন' বছর। নাম রেখেছে বাপি। শচীকান্তর মতই দেখতে। মুখের ওপর ভাগটা একেবারে শচীকান্তর মুখের মত। নীচের ভাগটা রমার মত।

বাপির ভাল নাম চঞ্চল। ভারি দুরন্ত বলে তেজেন্দ্র তার নাম রেখেছেন চঞ্চল।

রমার মন মাঝে মাঝে শচীকান্তর জন্যে অধীর হয়ে পড়ে। চঞ্চলকে দেখলে তার মনে স্থৈর্য্য ও ধৈর্য্য ফিরে আসে। তাকে নিয়েই তার আগামী দিনের সুখের দিন গোণে।

একদিন চঞ্চল বললে, মা, বাবা কোথায়?

রমা কোন রকম উত্তর দিতে পারে নি।

ছেলের মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বললে, উনি বিদেশে আছেন। সময় হলে আসবেন।

চঞ্চল অনেকবার শচীকান্তর কথা জিজ্ঞেস করেছে রমাকে। রমা নানাকথা ও খেলার মাঝে তাকে ছেড়ে দিয়েছে প্রতিবার যাতে-করে বাপের সম্বন্ধে দুশ্চিন্তা সে ভুলে থাকতে পারে।

জয়া অনেকবার এসেছে তেজেন্দ্রর বাড়ীতে। সুধাকান্তর কাছেও অনেকবার গিয়েছে।

চঞ্চল জয়াকে দেখলেই আনন্দে অধীর হয়ে ছুটে যায়। বলে, কাকু, চলো বেড়িয়ে আসি। বাবার কাছে যাই। মা বলেছে, বাবা বিদেশে থাকে। সেখানে চলো।

জয়া বলে, যাবে। আর একটু বড় হও। তখন যেও।

জয়া নিয়ে যায় না দেখে চঞ্চল আরও অধীর হয়। রমার কাছে এসে বলে, মা, কাকু আমাকে নিয়ে যাবে না। তুমি আর আমি যাবো বাবার কাছে।

রমা মুখ বুজে এসবই সহ্য করছে। এমনভাবে অনেকবার চঞ্চল তার বাবার খবর নিয়েছে।

শচীকান্তর দেখা না পেয়ে কেঁদেছে। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া বন্ধ করেছে।

রমা নিরুপায়। বারবার চঞ্চলকে বুঝিয়েছে। বলেছে, বড় হও। তারপর বাবার কাছে যাবে।

তেইশ

শচীকান্ত যোগদা আশ্রমে আছে। প্রথম দু'চার বছর সে বড় কষ্টেই কাটিয়েছে। মানসিক অশান্তিতে মুসড়ে পড়েছিল। এক দিকে দেবতা অন্যদিকে রমা—এই দু'ধারা চিন্তা তার মনকে চঞ্চল করে তুলেছিল।

পরে তেজানন্দর প্রভাবে সে ভাবটা খানিক কেটে গেল। মনের অন্তস্থলে রমার জন্যে আকুলি-বিকুলি হামাগুড়ি দিতে লাগলো।

একবার ভাবলো, আমি যোগী হতে চলেছি। আমার মধ্যে এরকম চঞ্চলতা শোভা পায় না। যোগীর মন হবে ধীর-স্থির। সে আনন্দোন্মত্ত হবে না, আবার দুঃখে বিচলিত হবে না। সে হবে স্থিতপ্রজ্ঞ।

কিন্তু ভাবলে কি হবে! যার মন একবার সংসারে প্রবেশ করেছে সে কি ঠিক ঠিক যোগীর জীবন লাভ করতে পারে? তাছাড়া ভারতীয় আধ্যাত্মিক চিন্তাধারার প্রতি শচীকান্ত চিরদিন কটাক্ষ করে এসেছে।

তেজানন্দ যেমনটি মনে করেছিলেন তেমনটি হলো না শচীকান্ত। দীক্ষা নেওয়ার একবছর পর অভিষেক হলো। নাম হলো আত্মানন্দ। নাম বদল হলো। অনুষ্ঠানও হলো। আসল জিনিস শূন্য।

নিত্য সকাল সন্ধ্যায় মন্ত্র জপ করতে বসে তার মনে রমার মূর্ত্তি ভেসে উঠতে লাগলো। তেজানন্দের কাছেও তার এ ভাবটা প্রকাশ

করতে পারলো না। কারণ তিনি জানেন আত্মানন্দ অবিবাহিত— চিরকুমার। বিবাহিত জানলে তার আর আশ্রমে থাকা চলবে না। ফিরে আসতে হবে সংসারে। আবার সেই অশান্তি।

তার চেয়ে সে গোপন রাখবে তার মনচিন্তা। কিন্তু সাধনপথে চলতে গেলে মানসিকরূপ প্রকাশ করা একান্ত দরকার। গুরুর কাছে কোনোরকম গোপন করা চলবে না। আত্মানন্দ তা করলো না। মিথ্যার মুখোসের মধ্যে নিজের অন্তররূপ লুকিয়ে রেখে সাধনভজনে মন দিলো। তাই মন থেকে দ্বন্দ্ব গেল না। চিরসাথী হয়ে রইলো। সাধনপথেও উন্নতিযোগ এলো না।

তেজানন্দ মাঝখানে বললেন, এতদিন হলো তুমি মন্ত্র নিয়েছ অথচ তোমার সাধনার কোন উন্নতি দেখছি না কেন? তবে কি তুমি ঠিক ঠিক ইষ্টমন্ত্র জপ করো না?

আত্মানন্দ নীরব। কিছু বললো না।

তাকে নিরুত্তর দেখে তেজানন্দ তাঁর দু'টি দুগ্ধধবল সবল বাহু দিয়ে আত্মানন্দর দু'বাহু ধরে সর্বাঙ্গ ঝাঁকিয়ে বললেন, বলো তুমি কে? তোমার এখানে আসা কি উদ্দেশ্যে? কেন তোমার সাধনায় উন্নতি হচ্ছে না?

এবার আত্মানন্দ মাটির পানে তাকিয়ে বললে, আপনি যে মন্ত্র দিয়েছেন তাই ত নিত্য জপ করি।

—তা জপ করলে এতদিন তোমার অনেক উন্নতি হওয়া উচিত ছিল। মনে হচ্ছে তুমি তা করো না।

—করি স্বামিজী।

—না। আমার মনে হয় না। দেখো প্রেমানন্দকে— আনন্দকে! আশ্রমের আর আর সন্ন্যাসী ছেলেদের দেখো। তারা কেমন আনন্দে আছে। তাদের মন, শরীর ও কাজ কেমন ধীর স্থির। আর তুমি? তুমি হচ্ছ অন্যরকম।

কথাগুলি বলতে বলতে তেজানন্দ কাঁপতে লাগলেন। তাঁর কণ্ঠরোধ হয়ে এলো।

পরে নিজেকে সংযত করে বললেন, যদি এখানে থাকবার ইচ্ছে হয় তবে আমার মতের সঙ্গে মিল রেখে ঠিকভাবে চলবে। আমি যা করতে বলবো তাই করবে।

বলে তেজানন্দ আত্মানন্দের ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আত্মানন্দ ভাবলো, গুরুর কাছে মিথ্যে কথা বলা মহাপাপ। সে নিজেকে প্রতারণা করেছে বলেই আজ এই শাস্তি।

এবার প্রতিজ্ঞা করলো, আর সে মিথ্যে কথা বলবে না। অন্তরের কথা লুকিয়ে রাখবে না। তার এই দশ বছরের আশ্রমবাস মিথ্যা হয়ে গেল।

চব্বিশ

এইটিই কি স্বামী তেজানন্দের আশ্রম ?

এক গৌরবর্ণ দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী যুবক প্রশ্ন করলো প্রেমানন্দকে।

প্রেমানন্দ সবিনয়ে মাথা নত করে ধীরভাবে বললে, হ্যাঁ, এইটিই তেজানন্দের আশ্রম।

তারপর বললে, আপনি কোথা থেকে আসছেন ?

সন্ন্যাসী যুবক বললে, আমি দেওঘরের অদ্বৈত আশ্রম থেকে আসছি।

—কি কাজ আপনার ?

—আপনাদের আশ্রম দেখতে এলুম।

—বেশ, আসুন তবে, ভেতরে আসুন।

প্রেমানন্দ সন্ন্যাসী যুবককে সঙ্গে করে ভেতরে নিয়ে গেলো। আশ্রমাধ্যক্ষ স্বামী তেজানন্দ ভেতরে রান্নাঘরের সামনে পায়চারি করছিলেন। প্রেমানন্দের সঙ্গে একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী যুবককে দেখে থমকে দাঁড়ালেন।

প্রেমানন্দ গুরুকে নমস্কার করে বললে, ইনি এসেছেন দেওঘরের

অদ্বৈত আশ্রম থেকে। আমাদের আশ্রম সম্বন্ধে খুঁটিনাটি জানতে চান।

তেজানন্দ হেসে বললে, সেত ভাল কথা।

তারপর বললেন, কি নাম আপনার?

—আমার নাম মোহিতানন্দ।

ধর্ম বিষয়ে দু'একটি কথা বলার পর মোহিতানন্দকে শিষ্য-মণ্ডলীর মাঝে বসিয়ে রেখে তেজানন্দ বিষ্ণুর মন্দিরে এলেন।

মোহিতানন্দ, প্রেমানন্দ, গুণানন্দ, আত্মানন্দ প্রমুখ গুরুভাইদের সঙ্গে নানারকম বিষয় নিয়ে আলোচনা করলো।

আলোচনা করতে করতে কেবল আত্মানন্দের মুখের দিকে বারংবার তাকাতে লাগল।

এতে আত্মানন্দ সামান্য অস্বস্তি বোধ করলেও কিছু বললো না।

মোহিতানন্দ তাকিয়ে থাকে আত্মানন্দের মুখের দিকে। হ্যাঁ, সেই চোখ, সেই নাক। ঠোঁটের কাছে কাটার দাগ। বাঁ চোখটা একটু ছোট ডানচোখের তুলনায়। ঠিক শচীকান্তর চেহারার সঙ্গে একেবারে হুবহু মিল। সত্যব্রত যেমনটি বলেছিল ঠিক তেমনি। গলার স্বরও অনেকটা সেইরকম।

সুধাকান্তর কাছে সত্যব্রত শচীকান্তর বিয়ের একটা ফটো চেয়ে নিয়েছিল। তার সঙ্গে শচীকান্তর চেহারা সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বর্ণনাও জেনেছিল। সেই ফটোর এক কপি মোহিতানন্দকে দিলো। বললে, কালীপ্রসাদ, এই নাও চাবিকাটি। এই দিয়ে আসল রত্নকে খুঁজে বের কোরো।

কালীপ্রসাদ কোলকাতার ইন্টেলিজেন্স্ ব্রাঞ্চের ধুরন্ধর কর্ম-চারী। সত্যব্রতর অতিশয় প্রিয়পাত্র। সম্পর্কে আত্মীয়ও।

শচীকান্তর সন্ধান নেওয়ার জন্যে কালীপ্রসাদকে ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাঠান সত্যব্রত। বিশেষ করে জয়ার কাছে যখন জানতে পারলো শচীকান্তর মনটা আধ্যাত্মিক বিষয়ে বিশেষ উৎসুক। তার ওপর বিশ্বাস করে সত্যব্রত কালীপ্রসাদকে সন্ন্যাসীবেশে ভারতের

কয়েকটি তীর্থস্থানে যেতে বললো। আর হরিদ্বারের যোগদা আশ্রমে যাওয়া ত একান্তই প্রয়োজন। কারণ সেখানে জয়ার বাবার বন্ধু আশুতোষবাবুর গুরু তেজানন্দের যোগদা আশ্রম আছে। তাছাড়া বামপন্থী রাজনৈতিক দলে শচীকান্তর কার্যকলাপ পুলিশের চোখে কোনদিন ভাল লাগে নি। নইলে শচীকান্তর খোঁজে সত্যব্রতর এতটা মাথা ঘামানোর কোন কারণ ছিল না।

আত্মানন্দের সঙ্গে আলাপ হলো মোহিতানন্দের। সে জানতে পারলো আত্মানন্দ কবে কোনদিনে কত তারিখে যোগদা আশ্রমে এসেছে। সত্যব্রতর কাছে যে তারিখ জেনেছিল তার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলো ঠিক মিলে যাচ্ছে। সেইদিনের দু'একদিন আগে আত্মানন্দ ওরফে শচীকান্ত গৃহছাড়া হয়েছে।

সুতরাং আত্মানন্দ যে শচীকান্ত সে বিষয়ে আর কোন সন্দেহ রইলো না মোহিতানন্দের।

চারদিন পরে মোহিতানন্দ কোলকাতার উদ্দেশে রওনা হলো। আসার সময় প্রেমানন্দ, গুণানন্দ, আত্মানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীগণ মোহিতানন্দকে সি অফ্ করতে এলো স্টেশনে।

কোলকাতায় এসে সত্যব্রতর কাছে কালীপ্রসাদ শচীকান্তর সংবাদ দিলো। সে শচীকান্তর একটা ফটোও তুলে এনেছে গোপনে। সেটা দেখালো। শচীকান্তর দাড়ী কামানো। মাথার চুল ছোট ছোট করে কাটা। তার ওপর গেরুয়া রঙের পাগড়ী বাঁধা। তারপর বললে আত্মানন্দের যোগদা আশ্রমের প্রবেশের দিন। সব-কিছু শুনে সত্যব্রত বুঝতে পারলো, আত্মানন্দ আর কেউ নয় এ সেই শচীকান্ত—সুধাকান্তর ছোট ভাই—রমার স্বামী—চঞ্চলের বাবা।

পরে সত্যব্রত সুধাকান্তকে সংবাদটি দিলে।

জয়া শুনে বললে, সত্যব্রতবাবুর অনুমান মিথ্যে হবে না। শচীকান্ত হরিদ্বারে যোগদা আশ্রমের কথা আমার কাছে আগেই শুনেছিল। সুতরাং সেখানে তার যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়।

জয়া এসে রমাকে সুসংবাদ দিলো।

রমার দু'চোখ অশ্রুতে ভরে উঠলো। এমন আনন্দের উৎস হৃদয়ে চেপে রাখতে পারলো না। বললে, ঠাকুরপো তুমি হরিদ্বারে গিয়ে দাদাকে নিয়ে এসো।

জয়া বললে, ওখানে এখন না গিয়ে এখান থেকে এমন একটা কৌশল করা যেতে পারে যাতে করে আত্মানন্দ বাবাজী আপনি-শুড়শুড় করে ঘরে ঢুকবে।

রমা কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে অসীম আগ্রহভরে শুধোয়, কি কৌশল ঠাকুরপো ?

—আপনাকে দিয়ে হবে না—উঁহু, আপনাকে দিয়ে হবে না তাহলে ও আসবে না।

রমা জয়ার হেঁয়ালীমাখা কথার সদর্থ ঠিক বুঝতে পারলো না। বললে, আমাকে দিয়ে কি হবে না ? আমি তাঁর জন্যে কি করতে পারি ?

জয়া বললে, বলছি।

—বলো, শুনি।

—বলছি কি, আপনি আত্মানন্দ বাবাজীকে চিঠি লিখলে উনি আসবেন না। কারণ সন্ন্যাসীরা স্ত্রীর মুখ দেখতে একেবারেই নারাজ। তাই তাকে ফিরিয়ে আনতে হলে চঞ্চলকে দিয়ে একটা ছোট্ট চিঠি লিখিয়ে পাঠান। ছেলের প্রতি স্নেহের টানে যদি সে ঘরে ফেরে। এছাড়া অন্য কোন উপায় দেখছি না।

রমা খানিকক্ষণ জয়ার কথা ভাবলো। পরে বললে, তোমার যুক্তি ঠিক। আমি আজই বাপিকে দিয়ে চিঠি লেখাচ্ছি।

জয়া একমুখ হাসি নিয়ে রমার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো, বিয়ের আগে রমাকে দেখতে এসে তার মুখের ভাব যেমনটি লক্ষ্য করেছিল আজ ঠিক সেই ভাব ফুটে উঠেছে সারা মুখে। তার সর্বাঙ্গেও এসেছে এক অভূতপূর্ব আনন্দের হিল্লোল।

পঁচিশ

মাধ্যাহ্ন ভোজনের পর সন্ন্যাসীদের দিবানিদ্রা নিষেধ। সকলে যে যার কাজে ব্যস্ত থাকে। কেউ বই পড়ে, কেউ হাতের কাজ করে, কেউ মায়ের মন্দির পরিষ্কার করে।

অন্যদিন আত্মানন্দ মাধ্যাহ্নভোজনের পর চরকায় তূলা কাটতে বসে। আজ তার মন চঞ্চল। তাই তূলাকাটা বন্ধ করে নিজের ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়লো। প্রেমানন্দকে বললে, আমি আজ চরকায় হাত দেবো না। ঘরে বসে শাস্ত্রপাঠ করবো।

তেজানন্দের কানে কথাটি পৌঁছয় নি। আত্মানন্দ শাস্ত্রপাঠের ছল করে নিজের ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে দিলো।

মাথার বালিশের তলা থেকে আত্মজের সেই ছোট্ট লিপিখানি বের করে পুনরায় পড়লো। এবারও তার মন যেন কেমন মোচড় দিয়ে উঠলো।

অনেক কথা মনে এলো আত্মানন্দের। বাল্যকাল থেকে আরম্ভ করে যৌবন পর্যন্ত।

রমার মুখটা বারবার ভাবতে লাগলো। সেই সুন্দর মুখের গড়ন অতি অল্প মেয়েরই হয়। তার মা বকুলরাণী বড় সখ করে রমাকে ঘরে এনেছিলেন। তারপর এক দুরন্ত ঝড়ে কে কোথায় ছিট্‌কে পড়লো।

অনেক রকম চিন্তায় তার মন উদ্বেল হয়ে উঠলো। একবার ভাবলো, আশ্রম ত্যাগ করে আবার বাড়ী ফিরে যাবে। রমাকে নিয়ে ঘর করবে। রমা এখন কত সুন্দর হয়েছে! সে এখন সন্তানের মা। তার মনে এখন হয়ত আগেকার জীবনের পাপ নেই। মাতৃত্বের শুভ্রোজ্জ্বল প্লাবন এসে সে পাপ ধুয়ে মুছে দিয়েছে। আর যদি রমার মধ্যে এখনো কোন পাপ থাকে তবে এখনকার আধ্যাত্মিক

শক্তি সেই ক্ষমা ও ধৈর্য দিয়ে সে সেই পাপ খণ্ডন করার ক্ষমতা পাবে। আদর্শ নারীজীবন লাভ করে ধন্য হবে রমা।

আবার ভাবে, না। আর সে সংসারে ফিরে যাবে না। একবার যখন মায়ার বন্ধন ত্যাগ করেছে আবার ঐ দুঃখের জাঁতাকলে পা দেবে কেন? এই ত বেশ জীবন। একান্তভাবে নির্লিপ্ত—উদাসীন। সর্ববিষয়ে আসক্তিশূন্য। এতেই তো সে তৃপ্তি পায়।

আবার পড়লো বাপির চিঠিটা। বারংবার পড়লো। যতবার পড়ে ততবারই নতুন করে চিনতে থাকে আত্মানন্দ নিজেকে। ভাবে, একি করছে সে? সে ত সংসারী। তাকে সন্ন্যাসী সাজালো কে? কেনই বা সে সন্ন্যাসী হবে! স্ত্রীর প্রেম—পুত্রের ভক্তি কি তুচ্ছ মানুষের জীবনে!

তার দাদা কত সুখে আছে! ছেলে-বৌ নিয়ে। আর সে এতদূরে একা একা কি সুখে পড়ে আছে! অমৃত? দেবতার সন্ধান? তাঁর দর্শন? এসবে তার কি হবে? শান্তি দেবে? সুখ দেবে? কৈ দিয়েছে শান্তি? এতদিন ধরে ত যোগ করছে তবু মন চঞ্চল কেন? নিজের কাছে নিজে বশীভূত নয় কেন? এত কেবল ধোঁয়া। আর সন্ন্যাসী হলেই বা, সংসারী হয়েও ত অনেকে সন্ন্যাসীর মত জীবন কাটাতে পারে। আসল কথা হলো অন্তরের পরিবর্তন। অন্তরের পরিবর্তন এলে সংসারও স্বর্গ হয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ নিজের জীবন দিয়ে তাই প্রমাণ করে গেছেন। ধর্ম ত অন্তরের ঐশ্বর্য।

বহুরকম চিন্তার মধ্যে কয়েকদিন কাটালো আত্মানন্দ। শেষে ঠিক করলো, সে বাড়ী ফিরে যাবে। আশ্রমে আসার সময় যেমন-ভাবে সে অতর্কিতে গোপনে এসে প্রবেশ করেছিল ঠিক তেমনিভাবে গোপনে অকস্মাৎ আশ্রম থেকে চলে যাবে। আশ্রমের কেউ জানতেও পারবে না।

কয়েকদিন ধরে আত্মানন্দ আশ্রম ত্যাগের চিন্তায় কাটালো। শেষে উপায় পেয়ে গেল। একদিন গভীর রাতে আশ্রম ত্যাগ করে ঘরমুখো হলো।

রাতের তারা রইলো তার যাত্রাপথের সাক্ষী। একবার আশ্রমের দিকে তাকিয়ে আত্মানন্দ প্রণাম করলো। তারপর হাঁটা সুরু করে দিলো স্টেশনের পথে। ওপরের দিকে আকাশপানে একবার তাকালো। একটা বড় তারা জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে দেখলো। ভাবলো, রমা হয়ত এমনিভাবে অশ্রুভরা ছলছল নয়নে তার অপেক্ষায় বসে আছে।

যেতে যেতে আবার দেখলো, ঊর্ধে আকাশের একটি নক্ষত্র হতে এক সুন্দর দেবশিশু বেরিয়ে এলো।

শচীকান্তকে ডেকে বলছে, আত্মানন্দ, এখুনি আশ্রমে ফিরে যাও। তোমার গুরুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এসো।

ওর কথা শোনামাত্র আত্মানন্দ সম্বিত ফিরে পেলো। এতক্ষণ ও যন্ত্রচালিত ছবির মত চলছিল পার্বত্য পথ ধরে।

এবার সে ঠিক করলো আশ্রমে ফিরে যাবে। ঐ শিশুকে আর দেখা গেল না। আগের মত কেবল নক্ষত্রটিকে দেখতে পেলো।

যাত্রা ভঙ্গ করে আবার ফিরলো।

অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে প্রবেশ করলো আশ্রমে। নিজের ঘরে এসে বিশ্রাম করতে লাগলো।

সে রাতে যাত্রা স্থগিত রইলো।

স্থির করলো, পরদিন সকালে গুরুদেব তেজানন্দর কাছ থেকে বিদায় নেবে।

পরদিন সকালে যথারীতি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে আত্মানন্দ এলো তেজানন্দের কক্ষে।

তেজানন্দ তাকে দেখে বললেন, কি মনে করে এমন সময় এলে ?

আত্মানন্দ বললে, বিশেষ কারণে এসেছি স্বামিজী।

—কি কারণে আত্মানন্দ ?

—বিশেষ পরিস্থিতি আমাকে আসতে বাধ্য করলো। তাই এলুম।

তেজানন্দ একটা গম্ভীর হাই তুলে, 'হরিবোল' 'হরিবোল' ধ্বনি আওড়াতে আওড়াতে বললেন, কিসের পরিস্থিতি আত্মানন্দ ?

এবার গলার স্বর নরম করে বিনয়ের সঙ্গে বললে আত্মানন্দ, আজ্ঞে আপনি যদি আমায় সাহস দেন তো বলি।

—কেন অতো দ্বিধা করছো আত্মানন্দ।

—আজ্ঞে আমি একটা অপরাধ করেছি।

অপরাধ! বিস্মিত হলেন তেজানন্দ। ক্ষণিক তীক্ষ্ণদৃষ্টি দিয়ে আত্মানন্দর সর্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করলেন। তারপর বললেন, কি এমন অপরাধ করেছ আত্মানন্দ? বলো—বলো তুমি। তোমার কোন সঙ্কোচ নেই। এটা আশ্রম আর আমি গুরু। সুতরাং এখানে দ্বিধা, সঙ্কোচ বা ভয় কোনটিই স্থান পায় না। তোমার অপরাধ নির্ভয়ে স্বীকার করো।

—আজ্ঞে আপনি রাগ করবেন না ?

—না। মানুষ যাতে অপরাধ না করে সেই ব্যবস্থা করার জন্যেই তো আমি এখানে আছি। কলিযুগে মানুষ তো অপরাধ করবে। তাতে আর আশ্চর্য কি। বলো, বলো তোমার কথা। কি অপরাধ তোমার ?

আত্মানন্দ মিহি গলায় বললে, আমি বিবাহিত। আপনার কাছে আমি মিথ্যে কথা বলেছি। তাছাড়া আমার একটা ছেলেও আছে। এই দেখুন তার চিঠি।

আত্মানন্দ ছেলের চিঠিটা বের করে তেজানন্দর হাতে দিলো।

তেজানন্দ এক নিমেষে চিঠিটা পড়ে বন্ধ করে বললেন, এরকম মিথ্যে কথা বলার কারণ কি তা আমি জানতে পারি কি ?

আত্মানন্দ বললে, হ্যাঁ। আমি সবই বলছি। আপনি শুনুন আমার সব কথা।

আত্মানন্দ একে একে সব কথা বললে।

তেজানন্দ বললেন, তোমার জীবনটা তো বড় অদ্ভুত দেখছি। আমার মনেও তোমার সম্বন্ধে একটা সন্দেহ জেগে ছিল। তোমার

প্রকৃতি ও হাবভাব দেখে ভেবেছিলুম, তুমি বিবাহিত। এখন দেখছি আমার সে সন্দেহ মিথ্যে নয়।

তারপর তেজানন্দ প্রেমের বিচিত্ররূপ ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, সংসারে বহুরকমের প্রেম আছে। ভাই ভাইকে ভালবাসে সে এক-রকমের প্রেম। বোন ভাইকে ভালবাসে সে একরকমের প্রেম। বোন বোনকে ভালবাসে সেও এক রকমের প্রেম। পিতা ছেলেকে ভালবাসে বা মা ছেলেকে বা মেয়েকে ভালবাসে সেও একরকম প্রেম। স্বামী স্ত্রীকে ভালবাসে সেও একরকমের প্রেম। স্বদেশের প্রতি ভালবাসা সেও একরকমের প্রেম জানবে। তবে সকলের চেয়ে বড় প্রেম হচ্ছে দৈবী-প্রেম। এর যেমন গভীরতা আছে তেমনি আছে বিরাটত্ব। এর মূল্য অসীম। এ সংসারের যাবতীয় প্রেমের মুকুট-মণি। এ প্রেমমণি লাভ করলে সাংসারিক সকল রকম প্রেম তুচ্ছ বোধ হয়। এ প্রেম লাভ করলে অন্তরে দুঃখ থাকে না। আমরা এখানে বসে বসে সেই প্রেমের সাধনা করছি। তুমিও এখানে এসে-ছিলে তারই সন্ধানে। কিন্তু এখন তোমাকে বাড়ী ফিরতে হচ্ছে। তোমার যে সংসার আছে। সংসারের বন্ধন বড় বন্ধন। ও বন্ধন থাকলে পুরোপুরি সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। তোমার মনে আগে থেকে ও বন্ধন ছিল। তাই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী হতে পারো নি। তোমার মন চঞ্চল রয়েছে। সংসারের মায়া—তার পেছুটান অতি বড় জিনিস। তার হাত থেকে ছুটি পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার।

একটু থেমে তেজানন্দ বললেন, তা বেশ! এখন তুমি কি করতে চাও?

—আমি আবার বাড়ী ফিরে যেতে চাই গুরুদেব। আপনি অনুমতি দিন।

—আমি অনুমতি দিতে পারি কিন্তু তোমার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে কে?

—আপনার কৃপায় সব ঠিক হয়ে যাবে।

তেজানন্দ হেসে বললেন, তাকি হয় কখনো। পাপের ফল

নিজেকেই ভোগ করতে হবে। আর সেই সঙ্গে আমাকেও কিছু কষ্ট করতে হবে।

আত্মানন্দের চোখে জল এলো।

লুটিয়ে পড়লো স্বামিজীর চরণপদ্মে, আমি এতদিন আপনার কাছে যে মিথ্যেকে গোপন করে এসেছি আর যার জন্যে আমি পাপী আপনি সে পাপ ক্ষমা করুন স্বামিজী। আমি আপনার কৃপাপ্রার্থী।

তেজানন্দ এবার গম্ভীর গলায় বললেন, যাও আত্মানন্দ। বাড়ী ফিরে যাও। ক্ষমাই সন্ন্যাসীদের ভূষণ। আমি তোমার সমস্ত দোষ ক্ষমা করলুম। তবে দেখো, জীবনে আর যেন কখনো এরকম ভুল না করো।

তেজানন্দ নিজের আসন ছেড়ে উঠে গেলেন। বাইরের বারান্দায় এসে সিঁড়ি বেয়ে নামলেন ফুলের বাগানে।

আত্মানন্দ ধীরে ধীরে চলে এলো ঘরের বাইরে। আসার আগে গুরুর চৌকির ওপর মাথা রেখে প্রণাম করলো।

এরপর অন্যান্য গুরুভাইদের কাছে বিদায় নিয়ে আশ্রম ত্যাগ করলো।

ছাব্বিশ

এবার দিনের আলোয় বাড়ীর দিকে যাত্রা করলো শচীকান্ত। সন্ন্যাসীবেশেই এলো।

ট্রেনে চেপে আসার সময় দেখলো, দূর-দিগন্তে রুক্ষ প্রকৃতির মূর্তি। গেরুয়া রঙের কাপড় পরে প্রকৃতিদেবী নীরব ও গম্ভীর মুখে বসে আছে। তার অন্তরে ও বাইরে কেমন যেন শূন্যতা।

শচীকান্তর সঙ্গে তার যেন কোথাও মিল আছে। সেও আজ একাকী। তার অন্তর বৈরাগ্যের আঁচে শুকনো। উদাস মন।

সেখানে কাকে যেন পেলে ভাল হয়। একান্ত প্রিয়জন হবে সে। প্রাণ জুড়িয়ে ভালবাসা দিতে পারবে।

অনেক রকম চিন্তা জাগলো শচীকান্তর মনে। একবার ভাবলো রমা কি তাকে ক্ষমা করবে? বাপি কি তাকে ঠিকমত গ্রহণ করবে? তার কোলে উঠবে? বাবা বলে তার গলা জড়িয়ে ধরবে?

দু'ধারে রুক্ষমূর্ত্তি প্রকৃতির রূপ দেখতে দেখতে গাড়ী ছুটে চলেছে সামনের দিকে। একটানা কর্কশ বাঁশীর আওয়াজে আত্মানন্দের ভাবনায় ছেদ পড়লো।

সামনে তাকিয়ে দেখলো, একজনের কোলে একটি ছেলে ঘুমের ঘোরে কেঁদে উঠলো।

ওমনি শচীকান্তর মনে দোলা লাগলো। তার অন্তরটা মুচড়ে উঠলো ঐ কান্নার শব্দ শুনে।

আগের তুলনায় আরও বেশী শূন্যতা বোধ করলো অন্তরের অন্তস্থলে।

মুহূর্তের জন্যে প্রাণের মধ্যে হাহাকার ধ্বনি শুনতে পেলো শচীকান্ত। দু'চোখে জল এলো। একবার অস্ফুটস্বরে বলে উঠলো, দয়াময় ভগবান, আমার অপরাধ ক্ষমা করো। বাপিকে বাঁচিয়ে রাখো।

সাতাশ

বাড়ীতে এসেছে শচীকান্ত।

দরজায় করাঘাত করলো।

রমা দরজা খুলতে যাবে এমন সময় থমকে দাড়ালো। তার মনে যেন খট্‌কা লাগলো।

করাঘাতের আওয়াজটা তার কাছে সম্পুর্ণ নতুন লাগলো।

তাই একবার জিজ্ঞেস করলো, কে?

কোন উত্তর নেই। আরও জোরে জোরে করাঘাতের শব্দ শুনতে পেলো।

রমাও আর সাড়া দিলো না।

শচীকান্ত ঠিক বুঝতে পারলো, এ রমারই কণ্ঠস্বর।

এতদিন পরেও সে ভোলে নি রমার কণ্ঠস্বর। ঠিক মনে আছে। তেমনি প্রাণমাতানো মধুর স্বর। প্রথম বসন্তের প্রথম কোকিলকূজন।

ডাক দিলো শচীকান্ত, রমা—রমা, দরজা খোলো। আমি এসেছি।

রমা চমকে ওঠে। এমন সময় তাকে নাম ধরে পুরুষকণ্ঠে ডাকে কে ?

কান পেতে শুনলো, আবার ওরকম ডাক শুনতে পায় কিনা।

শচীকান্ত আবার ডাকলো।

রমা এবার স্থির থাকতে পারলো না।

হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল, বাপির চিঠির কথা। হরিদ্বারে সে চিঠি দিয়েছিল। তার ফল হয়তো এই।

আর দেরী না করে দরজা খুলে দিলো রমা। দেখলো গেরুয়াধারী এক সন্ন্যাসীকে। মাথায় পাগড়ী।

কপাল আর নাক দেখে রমা চিনলো, এ সেই শচীকান্ত। তার হারানো স্বামী।

মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না রমার।

শচীকান্তর মুখেও কথা নেই।

পরে শচীকান্ত নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, আমি শচীকান্ত। চলো বাড়ীর ভেতরে।

এমন সময় চঞ্চল এসে রমাকে জড়িয়ে ধরলো।

—শেষ—